সেই দিনগুলি

সেই দিনগুলি

রঞ্জন ধর

: পরিবেশক :

উচ্চারণ

২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :

শ্রীমতী অসীমা ধর

১/৩, আচার্য প্রফুল্ল পার্ক

কলিকাতা-৭০০০৮৬

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ১৯৬১

মুদ্রক :

চৌধুরী প্রিন্টার্স

এ/১৫, রাজা এস. সি মল্লিক রোড

কলিকাতা-৪৭

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রী অজয় গুপ্ত

শ্রী মনোরঞ্জন ধর—

পূজনীয় অগ্রজ সমীপেষু

সেই দিনগুলি

না. আজ আর ঘুম আসবে না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে জয়া। টেবিলের ওপর রাখা জগ থেকে ঢেলে একগ্লাস জল খায় সে। তারপব দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। নির্জন রাস্তার লাইটপোষ্টের আলোগুলি তার মতই বিনিদ্র রজনীর প্রহর গুনছে। গেটের পাশে নিমগাছটার ঝাঁকড়ানো ডালপালার ফাঁক দিয়ে রাত্রির কালো আকাশের নীচে আলোগুলিকে কেমন রহস্যময় ঠেকছে। আশে পাশে কোথায় একটা কুকুর থেকে-থেকে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকছে। বড় রাস্তায় মাঝে-মাঝে একটা দু'টো লরী চলছে—ঝড়ের মত ভেসে আসছে তার শব্দ। অনেক দূরে কোথাও বোধ হয় বোমা ফাটছে—সত্তর দশকের স্মারক। জয়া নিমগাছটার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চেষ্টা করে মনটাকে নির্লিপ্ত করে রাখতে। এ ছাড়া তার মুক্তি নেই। আজ ভাবতে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে ধেয়ে আসছে একরাশ প্রশ্ন—সেইসব প্রশ্নের সামনে সমস্ত যুক্তি খাবি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। আত্মরক্ষার পথ পাচ্ছে না জয়া। এমনি সংকট আরও একবার দেখা দিয়েছিল তার জীবনে। তখনো কতরাত্রি এমনি না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু সে হৃদয়ের ভাবাবেগের কাছে হার স্বীকার করেনি। যুক্তিই ছিল তার পথ নির্দেশক। আজ সে তা পারছে না কেন? শান্তনুর জন্য তার হৃদয়ের গভীরে এমন প্রচণ্ড অনুভূতি লুকিয়েছিল অথচ সে নিজেই তা জানতে পারেনি!

'ঘরে চল জয়া।' জয়া টের পায়নি কখন পার্থ এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি শোওগে। আমি একটু পরে যাচ্ছি।' জয়ার কণ্ঠস্বর নির্লিপ্ত। পার্থ কথা বলে না কিছুক্ষণ। নিঃশব্দে পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকে। জয়া তাকায় না তার দিকে। তবুও সে বুঝতে পারে পার্থর দৃষ্টি জয়ার ওপর নিবদ্ধ—তার চোখে সার্চলাইট। সে দেখতে চায় জয়ার ভেতরটা। জানতে চায় তার মনের অবস্থা। হয়ত রয়েছে তার দু'চোখে পুরুষের চিরন্তন ঈর্ষার আগুন।

'এ-ভাবে না ঘুমিয়ে কত রাত কাটাবে?' প্রশ্ন করে পার্থ।

'ঘুমের ওপর কি মানুষের ইচ্ছা খাটে?' পাল্টা প্রশ্ন করে জয়া।

'খাটে বৈকি! যারা মনটাকে কমপ্লেক্সের ডিপো করে রাখে, তারাই ঘুমুতে পারে না। ঘরে চল।' পার্থ জয়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে ঘরের মধ্যে।

তবুও ঘুম আসে না জয়ার। শুয়ে থাকাই সার। স্মৃতির মিছিল চলে তার মনের পর্দায়। সত্যি, জয়া বড্ড ইমোসনাল হ'য়ে পড়েছে। পার্থ ঠিকই বলে। কমপ্লেক্স। একমাত্র যুক্তিই তাকে বাঁচাতে পারে এর হাত থেকে।

জয়া তার পিঠে পার্থর হাতের স্পর্শ অনুভব করে। পার্থ তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নেয়। জয়া বাধা দেয় না। বরং নিঃশব্দে সে আত্মসমর্পণ করে তার উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে। যে যন্ত্রণা তার মনটাকে কুঁড়ে খাচ্ছে তার রাত্রির ঘুম কেড়ে নিয়েছে—তার হাত থেকে মুক্তির এ-ছাড়া অন্য কোন উপায় এই মুহূর্তে তার সামনে নেই। সে অনুভব করে, তার নিস্তেজ স্নায়ুগুলি দ্রুত রক্ত সঞ্চালনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে। ধীরে ধীরে একটা জৈবিক উত্তেজনা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর কখন তার শ্রান্ত অবসন্ন দেহ ঘুমের আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যায়, টের পায় না সে।

পাখির কলরব শুনে ঘুম ভাঙ্গলো তার। রোজ ভোর হতেই নানা জাতের পাখিরা এসে নিমগাছটার ডালে বসে ডাকতে শুরু করে। কাক, শালিখ, দোয়েল আরো কত রকমের পাখি। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল জয়া। চোখ দু'টো এখনো জ্বালা করছে। মাথাটাও ধরা। কেমন ভার ভার। টুথ-ব্রাসে পেষ্ট লাগিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিম-গাছটার মাথার ওপর দিয়ে সূর্য উঠছে। চারদিকে শুরু হ'য়ে গেছে জীবনের কর্মচাঞ্চল্য। রাত্রির সমস্ত রহস্য এখন উধাও। পূবাকাশের রক্তবর্ণ তরুণ সূর্যের দিকে তাকিয়ে জয়ার মনে হল, আবেগ নয়, যুক্তির বর্ম নিয়েই জীবনের মুখোমুখি হতে হবে তাকে।

স্নান সেরে নিতে জয়া বাথরুমে ঢুকল। কলের মুখ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ সে জলের ধারা মাথা পেতে নিল। অন্য দিনের চেয়ে বেশী সময় লাগল স্নান সারতে। এতক্ষণে সে অনুভব করল তার সমস্ত বিষণ্ণতা যেন ধুয়ে-মুছে গেছে মন থেকে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই চোখাচোখি হল পার্থর সঙ্গে। সে বাথরুমে ঢুকবে বলে অপেক্ষা করছে। কথা বলেনি সে। তবুও জয়া লক্ষ করল পার্থর চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। সে কী জানতে চায়, বুঝতে পারে জয়া। সে হয়ত খুশী হবে যদি শান্তনু সম্পর্কে জয়ার প্রতিক্রিয়া নিতান্তই একটা সাময়িক আবেগের ব্যাপার হয়ে শেষ হয়ে যায়। খবরটা শোনার পর হঠাৎ জয়া কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ সে কিছু ভাবতে পারেনি। নিঃশব্দে বসেছিল। যতই সময় যেতে লাগল, তার মধ্যে দেখা দিতে লাগল অস্থিরতা। আর পারছিলনা সে। হাসপাতালে শান্তনুকে দেখতে যাবে বলে তৈরী হল। পার্থ অবাক! বিরক্তির সঙ্গে সে বলে উঠল, 'তাকে দেখতে তুমি যাবে কেন?' সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, জয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে শুধু বলল, 'আমাকে যেতেই হবে।' জয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা

না করে সোজা চলে গিয়েছিল মেডিকেল কলেজে। রাত্রে বাড়ী ফিরে এলে পার্থ একটিও কথা বলেনি তার সঙ্গে। জয়াও বলার আগ্রহ দেখায়নি। শুধু শুতে যাবার আগে সে বলল, 'শান্তনু তো তোমারও বন্ধু ছিল এক কালে। অনেক দিন একসঙ্গে পার্টি করেছ।'

পার্থ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?'

'হয়নি কিছু। আমি ভাবছি, রাজনীতি করতে গিয়ে আমরা আজ সামান্য হৃদয়বৃত্তি পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছি। তুমি তার সম্পর্কে একটা কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলে না।' জয়া খুব শান্তভাবেই বলেছিল।

'অত সস্তা সেন্টিমেন্ট আমার নেই। শত্রুকে আমি শত্রু হিসেবেই দেখি।' কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠেছিল পার্থর। সে আরও বলল, 'তুমি আজ বড্ড বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে!'

এ ভাবে পার্থ তাকে বিদ্রূপ করবে ভাবতে পারেনি জয়া। চট করে একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও সে নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'হ্যাঁ, বিচলিত হয়েছি বৈকি! তোমার মত অমন বিপ্লবী কজন হতে পারে?' সে আর অপেক্ষা করেনি। পাশের ঘরে এসে একটা বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মন বসাতে পারল না। চোখের ওপর দিয়ে অক্ষরগুলি গড়িয়ে যায়— মনের ওপর সামান্য দাগও পড়ে না। বইটা রেখে দিয়ে উঠে পড়ল জয়া। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

পার্থ ঠিকই বলেছে। সস্তা সেন্টিমেন্ট তার নেই। কিন্তু এই নিয়ে জয়া কি আজ তার ওপর রাগ করতে পারে? সে-ও তো একদিন নিজেকে ঠিক এভাবেই গড়তে চেয়েছিল! যুক্তি আর আদর্শই ছিল তার কর্তব্যের নির্দ্ধারক। শান্তনুর সঙ্গে তার বিরোধ যখন তুঙ্গে তখনও সে এই নিবিখ মেনে নিয়েই নিজের কর্তব্য স্থির করেছিল। আজ যদি তার আচরণে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, পার্থর বলার অধিকার আছে বৈকি! শান্তনু শত্রু-শিবিরের লোক। জয়ার সঙ্গে

তার অতীত সম্পর্ক যাই থাক, আজ সে শত্রু ভিন্ন কিছু নয়। শত্রুর ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করা সস্তা সেন্টিমেণ্ট ছাড়া আর কি? কিন্তু তবুও এই যুক্তি আজ জয়ার প্রাণের সম্মতি আদায় করতে পারছে না কেন? কেন সে ছুটে গেল শান্তনুকে দেখতে? এর জবাব জয়ার জানা নেই। হাসপাতালের বিছানায় দেহের নানা জায়গায় আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রক্তাপ্লুত অচেতন শান্তনুকে দেখে জয়ার মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল, তার নাম কি আবেগ? সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তার শয্যার পাশে! এই সবই যদি আবেগ হয়, জয়া কি করবে? তার তো শক্তি নেই এর বিরুদ্ধে লড়ার। তিনদিন ধরে অচেতন শান্তনুর সেই অসহায় মুখ কেবলই তাকে টানছে। পারছেনা সে নিজেকে শান্ত রাখতে। কলেজ কামাই করে সে দু'বেলা ছুটে যাচ্ছে হাসপাতালে।

আজ শান্তনুর অপারেশন। ন'টার মধ্যে জয়াকে হাসপাতালে পৌঁছুতে হবে। সে তাড়াতাড়ি শাড়ি ব্লাউজ পরে নিল। চুলটা ঠিক করতে বড় আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল জয়া। তিন রাত্রির অনিদ্রা কারো মুখে এমন ভাবে ছাপ ফেলে? ভয় পেয়ে যায় সে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে পার্থ দেখল জয়া বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছ এখন?'

'হাসপাতালে।'

'একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

'তাই নাকি? আমার তো তেমন মনে হচ্ছে না।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যের কি আছে এতে? সবার মন কি একরকম হয়?'

পার্থকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জয়া বেরিয়ে

পড়ল। পেছন থেকে রাজুর মা চেঁচিয়ে উঠল—'দিদিমনি, চা খেয়ে গেলে না?' জয়া তার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, 'আমার সময় নেই।' পার্থর চোখের নির্বাক জ্বলন্ত দৃষ্টি তার নজরে পড়ল না। দ্রুতপায়ে সে বাস রাস্তার দিকে চলল।

পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে। বাস নেই। জয়া লক্ষ করেছে, বেশী প্রয়োজনের সময় ঠিক এমনি হয়। দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে যায়, তবু বাস-এর দেখা মেলে না।

'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!' একটা খালি ট্যাক্সি সামনে দিয়ে যেতে দেখে জয়া চেঁচিয়ে ওঠে। ব্রেক কষে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে যায়। জয়া ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

'মেডিকেল কলেজ। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই।'

'জী মেমসাব!' মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভার স্পীডোমিটারে স্পীড তোলে।

পার্থ এখন কি ভাবছে? যা খুশী ভাবুক। তবু ভালো চেঁচামেচি শুরু করে দেয় নি। তা হ'লে জয়াই কি ছেড়ে দিত? সে যা মনে আসে বলবে আর তাই তাকে মেনে নিতে হবে? কক্ষনো না। নিজের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে জয়া আস্থা হারিয়ে ফেলেনি এখনো। সে যা ভালো বুঝবে তাই করবে। অতীতেও সে তাই করেছে। ভাবতে অবাক লাগে জয়ার! পার্থ যেন আজকাল কেমন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শান্তনুর ব্যাপার নিয়ে সে যা করল—এ রকম হৃদয়হীনতা তার কাছে আশা করেনি জয়া। সে খুব ভালো করেই জানে, শান্তনুর সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে, তবু তাকে তার অমন বিপদের সময় দেখতে যেতে বাধা দেওয়ার কোন মানে হয়? এ অত্যন্ত অন্যায়। অনুদারতাও। আজ আদর্শগত বিরোধ যতই থাক, তার জীবনের সঙ্গে পনের বছর ধরে সে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল—সেটা অস্বীকার করা জয়ার পক্ষে কেমন করে

সম্ভব! পার্থ মাঝে মাঝে বড় অবুঝ হয়ে পড়ে। হোক। তা বলে জয়া নিজের বিবেকের নির্দেশ অমান্য করতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কিছু দিনের মধ্যেই শান্তনুর সঙ্গে জয়ার পরিচয় হয়েছিল। কেতকীর মাধ্যমেই তাদের প্রথম আলাপ। শান্তনু তখন একজন বড় ছাত্র নেতা। ভালো বক্তা। খুব পপুলার। জয়া ভাবতে পারেনি যে কেতকী তাকে হঠাৎ এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলবে। সে তাকে ক্লাশ-রুম থেকে ডেকে নিয়ে গেল করিডোরে আর ঠিক এনে হাজির করল শান্তনুর সামনে।

'শান্তনু, এই হচ্ছে জয়া। তোমার বক্তৃতা নাকি ওর দারুণ ভালো লাগে।' হাসতে হাসতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কেতকী।

কেতকীর ওপর খুব রাগ হয়েছিল জয়ার। ডানপিটে মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে হৈ হুল্লোর করে আড্ডা দেয়। রাজনীতি করে। সে কি ভেবেছে জয়া ও তার মত? জয়া বরাবর মেয়েদের স্কুলে কলেজে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে মেশার কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। এতদিনের মধ্যে ক্লাশের পাঁচটা ছেলের সঙ্গেও তার তেমন আলাপ পরিচয় হয় নি।

'আপনি বিজনদার বোন, আমি জানতাম না। কাল পার্টি অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা—তিনিই বললেন।' খুব সহজভাবে হাসি মুখে শান্তনু কথাগুলো বলেছিল। যেন জয়ার সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। জয়া কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তবু তার সহজ কথা বলার ধরনে সেও খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছিল।

'শুনুন, আপনাকে কিন্তু আমাদের কাজের মধ্যে চাই।' সোজা জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল শান্তনু।

'অসম্ভব। আমি এ সবের কিছু বুঝি না।' জয়া আপত্তি না জানিয়ে পারেনি।

'তাতে কি হয়েছে? সবাই কি গোড়া থেকে সব জেনে বসে

থাকে? জেনে নিতে হয়। আপনি ও জানবেন, বুঝবেন। তার আগে দরকার জানার ইচ্ছা।' শান্তনুর বোধ হয় এ ভাবেই কথা বলার অভ্যাস। যেন জয়ার সামনেও সে বক্তৃতা দিচ্ছে। সে আবার বলল, 'আমাদের মেয়ে কর্মীর বড় অভাব। এই অভাব দূর করতে আপনাকে আমরা চাই। আপনাদের ইকনমিক্‌স গ্রুপের দায়িত্বে রয়েছে রথীন—ও আপনাকে সাহায্য করবে। রথীনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'না। তবে তাকে চিনি।' জয়া বলেছিল।

'কেতকী তার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবে।'

শান্তনু ধরেই নিয়েছিল জয়া তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। ছাত্র আন্দোলন করবে। তার মতামতের যেন কোন মূল্যই নেই। এমন জোর খাটাবার অধিকার তাকে কে দিল? জয়া বিরক্তি বোধ করল। সে কি সেটা টের পেয়েছিল? নইলে বলল কি করে, 'আপনি কি রাগ করছেন? আপনি বিজনদার বোন—আপনার ওপর আমাদের দাবি আছে। আশাও আছে।' তার কথা শুনে জয়া হেসে ফেলেছিল।

'আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব। এখন আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে। চলি।' বলে চলে গিয়েছিল শান্তনু।

কেতকী ক্লাশের দিকে যেতে যেতে বলেছিল, 'শান্তনুকে তোর কেমন লাগল রে?'

'কেমন আবার! বড্ড নেতা নেতা ভাব।' বলেছিল জয়া।

'ও তো নেতাই। ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু বলতে পারিস। ওর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে?'

'হয়েছে বাবা, হয়েছে! তুই যে ওর একজন অন্ধ ভক্ত, বুঝতে আমার বাকি নেই।' বলেছিল জয়া। দু'জনই হাসতে-হাসতে ক্লাশ-রুমে ঢুকেছিল।

এই ঘটনার পর অনেকবার শান্তনুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তাদের মিটিংয়েও তাকে যোগ দিতে হয়েছে। জয়া পারেনি তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে।

মাস কয়েক বাদে আর একদিন শান্তনু তাদের ক্লাশ-রুমের সামনে এসে দাঁড়াল। সামনের বেঞ্চেই বসে ছিল জয়া। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ইশারায় ডাকল। উঠে এল জয়া।

'চলুন।'

'কোথায়? এখন ক্লাশ রয়েছে যে।'

'বাদ দিন।'

'বাদ দেব?'

'হ্যাঁ! দরকারী কথা আছে।'

ক্লাশ পালানো জয়ার পছন্দ নয়, তবু সে আপত্তি করতে পারেনি। সে বেরিয়ে এসেছিল শান্তনুর সঙ্গে। তারা হাঁটতে হাঁটতে কফি হাউসের দিকে যাচ্ছিল।

শান্তনু উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'আপনি ওয়াণ্ডারফুল কাজ করেছেন। আমরা এত মেয়েকে কোন দিন এস-এফ-এর মেম্বার করতে পারিনি। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আপনার। আপনার কাছে আমাদের আরো অনেক প্রত্যাশা। অন্ততঃ আমার।'

সেদিন শান্তনুর প্রশংসায় জয়া তার বুকের মধ্যে এক রকমের আশ্চর্য মধুর কাঁপুনি অনুভব করেছিল বৈকি! কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারেনি। একটা ভাল লাগার অনুভূতি তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এক সময় জয়া বলল, 'আমি আর কতটুকু পারব? আমার ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ।'

শান্তনু দৃঢ় স্বরে বলল, 'না। ক্ষমতাকে ইচ্ছামত এক্সপাণ্ড করা যায়—সেই ক্ষমতা মানুষের আছে। আপনিও পারবেন।'

'আমাকে আপনি কতটুকু জানেন!'

'একটা ধারণা গড়ে তোলার পক্ষে কম নয়।' হাসল শান্তনু।

কফি হাউসে ঢুকে দেওয়ালের দিকের একটা টেবিলের সামনে

তারা বসল। শান্তনু বলল, 'যে জন্য আপনাকে ডাকা। এখন থেকে বৃহত্তর ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য আপনাকে তৈরী হতে হবে। শুধু ইকনমিক্‌স গ্রুপ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না।'

বলে কি! লোকটা কি পাগল? জয়া অবাক হয়। রাগও হয় তার ওপর। শান্তনু কি তার খামখেয়ালী ইচ্ছার জোয়ারে জয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়!

জয়া প্রতিবাদ করে বলল, 'অসম্ভব। যেটুকু করেছি শুধু আপনার মুখ চেয়ে।' জয়া নিজেই অপ্রস্তুত বোধ করল কথাটা বলে।

শান্তনু হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'তা হলে আমার মুখ চেয়ে আপনাকে আরো অনেক কিছু করতে হবে। আমি জানি আপনি পারবেন। নিজেকে এত ইনফিরিয়র ভাবছেন কেন?'

দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন এসে হাজির হল। সবাই ছাত্র-আন্দোলনের পাণ্ডা। একটা মিটিং বলা চলে। সেখানেই জয়া জানতে পারল তাকে ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশনে দাঁড়াতে হবে। জয়া ভীষণ ভাবে প্রতিবাদ করে উঠল—কিন্তু সবার সরব ইচ্ছার কাছে সেই প্রতিবাদ ভেসে গেল। শান্তনু হেসে বলল, 'দেখলেন তো আপনি কেমন পপুলার?' তারপর জয়া আর কথা বলেনি—সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল। সব রাগ গিয়ে পড়ল শান্তনুর ওপর। ফেরার পথে জয়া ইচ্ছা করেই সবার থেকে একটু পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু সেটা শান্তনুর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে নিজের গতি কমিয়ে তার সামিল হল। বলল, 'আপনার রাগ এখনো যায়নি বুঝতে পারছি।' জয়া জবাব দেয় নি। শান্তনু নিজেই আবার বলল, 'আপনি ভাববেন না। আপনাকে তৈরী করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।'

জয়া রেগে বলল, 'আমার মধ্যে কোন গুণ নেই! কেমন করে আপনি আমাকে তৈরী করবেন শুনি? আপনি কেতকীকে দাঁড় করালেন না কেন? ও তো অনেকদিন থেকে আছে আপনাদের সঙ্গে।'

'কাকে দিয়ে কতটা হবে আমি জানি। যাই হোক, আজ থেকে আপনাকে একটু সময় দিতে হবে।'

'কেন? আপনার ক্লাশ করতে হবে নাকি?'

'ধরুন কতকটা তাই।'

একটা ব্যাপার জয়ার লক্ষ এড়ায় নি। খবরটা শুনে কেতকী কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিল, 'শান্তনু তোকে লীডার না বানিয়ে ছাড়বে না দেখতে পাচ্ছি।' এর পর থেকে দু'জনের প্রাণখোলা সম্পর্কের মধ্যে যেন একটুখানি চিড ধরেছিল। কেতকীই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। প্রথমটায় জয়া বুঝতে পারেনি। কয়েকদিন বাদে ব্যাপারটা তার কাছে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। কেতকী কি তা হলে শান্তনুকে মনে-মনে ভালবাসে? তাই তার ভয়! জয়া ভেবেছিল, খোলাখুলি কথা বলে সে তাকে আশ্বস্ত করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। এর মধ্যে ঘটে গেল এমন একটা ঘটনা, যা জয়ার জীবনের ধারা একেবারে পাল্টে দিল।

সেদিন ছিল ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে ছাত্র-সভা। পুরো ক্যাম্পাস ভরে গেছে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ে। ডায়াসের এক পাশে বসে ছিল জয়া। সভাপতির আসন থেকে শান্তনু একজন-একজন করে বক্তার নাম ধরে আহ্বান জানাচ্ছে। হঠাৎ জয়া চমকে ওঠল। মাইকে সভাপতির ঘোষণা, এখন আপনাদের সামনে বলবেন কমরেড জয়া দত্ত। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেনা জয়া। সমস্ত রক্ত মুহূর্তের মধ্যে তার মাথার দিকে ছুটতে শুরু করল। ইচ্ছা হতে লাগল ছুটে গিয়ে ধাক্কা মেরে শান্তনুকে সভাপতির আসন থেকে নীচে ফেলে দেয়। সে ভেবেছে কি? তার খুশীমত সে চলবে? না। জয়া মাথা নীচু করে বসে রইল। কিছুতেই সে যাবে না মাইকের সামনে।

'এ-কি! বসে রইলেন কেন? আসুন।' জয়ার দিকে মুখ করে শান্তনু তাকে ডাকতে লাগল।

জয়ার কান্না এসে গিয়েছিল। এ-ভাবে এত লোকের সামনে তাকে অপদস্ত করে শান্তনুর কি লাভ! আগে একটু আভাস পর্যন্ত দেয়নি যে, তাকে বক্তৃতা করতে হবে। এ জেনে শুনে তাকে জব্দ করা ছাড়া আর কি?

জয়ার আশে-পাশে সবাই তাকে ঠেলতে লাগল। শান্তনুর চাপা কণ্ঠস্বরও সে শুনতে পেল, 'এনাউন্স ক'রে দিয়েছি। এখন না বললে খারাপ দেখায়। আসুন।'

শেষপর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে জয়াকে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হল। সে ভেবেছিল সবাইকে শুধু নমস্কার জানিয়ে ফিরে আসবে। তা হ'লেই শান্তনুর উপযুক্ত জবাব হয়। তা' করতে পারল না সে। শুনতে পেল, শান্তনু পেছন থেকে ফিস ফিস ক'রে বলছে, 'জয়া, ভয় নেই। যা' মনে আসে, তাই বল। গুছিয়ে বল।' শান্তনুর মুখে তার নাম! তুমি সম্বোধন! এই প্রথম। হ্যাঁ, জয়ার পক্ষে আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত ভয় কেটে গেল। তার মনে হল, ভালভাবে বলার সঙ্গে যেন শান্তনুর সম্মান জড়িত। না, জয়া চায়না তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হোক। এ ক'দিনে অনেক কিছু সে তার কাছে শিখেছে। শান্তনু নিজেও বোধহয় আশা করেনি জয়া এত সুন্দরভাবে বলবে। তুমুল করতালির মধ্যে সে মঞ্চ থেকে নেমে এল। নামবার সময় একবারও সে শান্তনুর দিকে তাকায়নি।

মিটিং শেষ হ'লে শান্তনু আবেগের সঙ্গে জয়ার একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, 'অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার ওপর তোমার যতই রাগ হোক, আজকের দিনটাকে ডায়েরিতে টুকে রেখো। তুমি আজকের সভার সবচেয়ে ভাল বক্তা।'

জয়াও কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সমস্ত রাগ আর অভিমান কখন ধুয়ে মুছে গেছে মন থেকে, সে টেরও পায়নি। হাসতে-হাসতে বলল, 'সব কৃতিত্ব আপনার।'

'চল, কফি-হাউসে। সেলিব্রেট করা যাক।'

দু'জন নিঃশব্দে চলতে লাগল। কফি-হাউসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল শান্তনু। জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'আজ ভিড় ভাল লাগছে না। একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসলে হয়। যাবে?'

'চল।' বলল জয়া। দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসল। আবার নিঃশব্দে চলা। নিঃশব্দ থেকেও যে কত কথা বলা যায়, জয়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে তারা এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চলে এসেছিল।

'মেডিকেল কালেজ আগয়া।' পাঞ্জাবী ড্রাইভারের নির্বিকার ঘোষণা। সম্বিত ফিরে এল জয়ার। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে ট্যাক্সি থেকে নেমে এল। মিটার উঠিয়ে ড্রাইভার স্টীয়রিংএ হাত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া ছেড়ে মিলিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। একটু দেরী হয়ে গেল। জয়া দ্রুতপায়ে হেঁটে সোজা চলে এল শান্তনুর ওয়ার্ডে। দরজার সামনে দেখা হল কালকের সেই রোগা কালো নার্সটির সঙ্গে। তাকে দেখে নিজে থেকেই বলল, 'কিছুক্ষণ আগে অপারেশন থিয়েটারে পাঠানো হল প্রফেসর রায়কে।'

'আজ তার অবস্থা কেমন?' নিজের উদ্বেগ যথাসম্ভব চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল জয়া।

'একই রকম। খারাপের দিকে যায়নি। আপনি গিয়ে অপারেশন থিয়েটারের সামনে অপেক্ষা করুন।' বলে নার্সটি অন্যদিকে চলে গেল।

২

জয়া সিঁড়ি বেয়ে তিন-তলায় উঠে এল। সিঁড়ি অতিক্রম করতে কষ্ট হচ্ছিল তার। একটু হাঁপের মত ভাব। কেমন নার্ভাস লাগছে। সে দেখল, অপারেশন থিয়েটারের সামনে একটি ছোট্ট জটলা—শান্তনুর বন্ধু ও কমরেডরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস ক'রে কথা বলছে। তাদের মধ্যে জয়ার চেনা লোকও আছে - এক কালের রাজনৈতিক সহকর্মী। তা'রা জয়ার দিকে একবার তাকাল, তারপর পূর্বের মতই নিজেরা কথা বলতে থাকল। অর্থাৎ নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তা'রা আজ তার সঙ্গে পরিচয় স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করল না। মনে মনে একটু হাসল জয়া। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে একজন জয়ার কাছে এগিয়ে এল। রথীন। শান্তনুর কলেজের সহকর্মী। রাজনৈতিক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও জয়ার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছেদ ঘটেনি এখন পর্যন্ত। হয়ত ঘটবেও না।

'অপারেশন কি শুরু হ'য়ে গেছে?' জয়া জিজ্ঞেস করল।

'না।'

একটু ইতস্ততঃ করল জয়া। বলবে কিনা ভাবছে। এদের সামনে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করার ইচ্ছা তার নেই। অবিশ্যি দুর্বলতার প্রশ্নই ওঠে না। সে যা করছে সেটা সম্পূর্ণরূপে কর্তব্যবোধের তাগিদে। টুকুনের কথা বিবেচনা করে। টুকুনের বাপির ভাল-মন্দর সঙ্গে জয়ার সম্পর্ক আছে বৈকি। তাদের একমাত্র মেয়ে টুকুন—সে পিতৃহীন হবে, সেটা জয়া কখনোই চায় না। অতএব জয়ার আচরণ সম্পর্কে ভুল বোঝার অবকাশ নেই।

'রথীন, ওকে একটু দেখা যায় না?' জয়া একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল।

'দেখবে?' রথীন বলল, 'এখানটায় দাঁড়াও। আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।'

রথীন এগিয়ে গিয়ে দরজা ফাঁক ক'রে নার্সের সঙ্গে কথা বলল। তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে ইশারায় ডাকল তাকে। বলল, 'ভেতরে যাও।'

অপারেশন থিয়েটারের লাগোয়া অন্য একটি ঘর। ট্রলি-বেডের ওপর শান্তনু চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। মৃতের মত নিস্পন্দ। গলা থেকে পা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। মাথার চুল কামানো—মাথা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ, রক্তে লাল। জয়া তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নাম ধরে ডাকল। চোখ মেলে তাকাল শান্তনু। তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ঠোঁট ফাঁক করে কিছু বলতে চাইল—পারল না। জয়া তার বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে ভাল হয়ে উঠতে হবে, শান্তনু। তোমার টুকুন-এর জন্য অন্ততঃ তোমার বেঁচে থাকা চাই।' জয়া দেখল, শান্তনুর চোখের কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। নিজেকে বস্তুবাদী বলে জাহির করলে কি হবে, আসলে শান্তনু খুব ইমোশনাল। নার্সের ইঙ্গিতে জয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আসবার আগে আবার সে তার কপাল স্পর্শ করে সান্ত্বনা দিল।

রথীন বলল, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ও-দিকের বেঞ্চটাতে গিয়ে বস। অনেক সময় নেবে। মাথা আর পেটে অপারেশন—ছ'টোই জটিল।'

জয়ার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। সে বলল, 'রথীন, ওকে তোমরা বাঁচাতে পারবে তো?'

'চেষ্টা তো করতে হবে। দেখা যাক।'

জয়া এসে করিডোরের একপাশে একটা বেঞ্চের ওপর বসল।

জয়ার মনে আছে, অসুখ-বিসুখ হলে শান্তনু বড় ঘাবড়ে যায়। হাসপাতাল সম্পর্কে তার চিরকালের ভয়। একবার সে শক্ত অসুখে

পড়েছিল। তখন কে যেন প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে। শুনেই শান্তনুর কী দারুণ আপত্তি। কেউ তাকে রাজি করাতে পারেনি। জয়াকে রাত জেগে তার সেবা-সুশ্রূষা করতে হতো। একদিন সে বলেছিল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

জয়া বলেছিল, 'কই—না তো।'

'না বললে কি হবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি। তার চেয়ে এক কাজ কর। আমাকে হাসপাতালেই ভর্তি করে দাও।'

'পাগল হয়েছ! ওখানে গেলে তোমার অসুখ বেড়ে যাবে।'

কি যেন ভেবে শান্তনু একটু পরে বলেছিল, 'হাসপাতালে যেতে যে আমার খুব ভয়, তা নয়। আসলে অসুখের মধ্যে আমার বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগে—তুমি আমার কাছে থাকছ, তাতেই যেন আমার অনেকটা যন্ত্রণা কমে যায়। কিন্তু তোমার তো খুব কষ্ট হচ্ছে।'

জয়াও সেদিন কেমন অনায়াসে বলতে পেরেছিল 'মোটেই না। তোমার কষ্ট দূর করতে পারলে কোন কষ্টই আমার গায়ে লাগে না।'

তাদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বাবার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল না রাজনীতি-করা কোন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়। অবিশ্যি বড়দার জন্যই তাঁর রাজনীতির প্রতি এমন বিতৃষ্ণা। অনেক ভরসা ছিল তাঁর বড় ছেলে সম্পর্কে। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর আইনের ব্যবসায় বড়দাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে নিজে ছুটি নেবেন কিন্তু হল উল্টো। বড়দা চলে গেলেন রাজনীতির জগতে, তা-ও এমন রাজনীতি, যার জন্য কতবার তাঁকে জেলে যেতে হল। সংসারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই রইল না।

শান্তনু আর জয়া দুজনই গিয়ে বড়দাকে ধরেছিল! বাবার মত করে দিতে। বড়দা হেসে বলেছিলেন, 'তোরা পাগল হয়েছিস! বাবা আমার কথায় রাজি হবেন?'

'তা হলে আমরা কি করব?' জিজ্ঞেস করেছিল জয়া।

'সবাই যা করে। তুই মাকে ধরে বাবাকে রাজি করাতে চেষ্টা কর।'

'যদি বাবা রাজি না হন—তা হলে?'

'তা-ও আমায় বলে দিতে হবে!' হাসতে হাসতে বলেছিল বড়দা।

শান্তনু এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার সে বলল, 'বিজনদা, আমি গিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'খুব ভাল প্রস্তাব। চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি? শেষ পর্যন্ত রাজি না হলে, তোমরা এখন বড় হয়েছ, যা ভাল বোঝা করবে।' এই ছিল বড়দার শেষ কথা।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল জয়া। শান্তনু একদিন তাদের বাড়িতে এসে হাজির হল বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলতে। জয়া নিজের পড়ার ঘর থেকে একবারও বেরোয়নি। কি কথা হয়েছে জানে না। এক সময় সে দেখল তার ঘরের দরজার সামনে শান্তনু দাঁড়িয়ে। জয়া কিছু জিজ্ঞেস করতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছিল না। অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে হল না। শান্তনুর মুখ দেখেই সে বুঝতে পারল।

রথীন এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, 'অপারেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি থাকছ, জয়া?'

'হ্যাঁ।'

'তা'হলে চল, বাইরে থেকে চা খেয়ে আসা যাক। দু'টোর আগে শেষ হচ্ছে না। কিছু খেতেও হবে।'

'চল।' উঠে পড়ল জয়া।

শান্তনুর বন্ধুরা তখনো জটলা করছে। তাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে জয়া চোখ নামিয়ে নিল। সে বুঝতে পারে তাদের মনোভাব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রথীন বলল, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার অস্বস্তি।'

'ওদের চোখের দৃষ্টি থেকে মনে হয় যেন শান্তনুর এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। শাস্তিটা আমারই প্রাপ্য।'

'ওদের দোষ দিয়ে কি লাভ? সম্পূর্ণ পরিবেশটাই তো বিষিয়ে গেছে। তোমার নিজের কথাই ভাব না কেন?'

জয়া মুখ তুলে রথীনের দিকে তাকায়। সে বুঝতে পারছে না তার কথার অর্থ। রথীন বলল, 'তোমরা স্বামী-স্ত্রীই এই বিষিয়ে-ওঠা পরিবেশের মধ্যে পরস্পরকে স্ট্যাণ্ড করতে পারলে না। অন্যদের কাছে তা' আশা কর কি করে?'

কথা বলতে-বলতে তারা কফি-হাউসের সামনে এসে হাজির হল। জয়া বলল, 'দেখ আমরা কোথায় চলে এসেছি!'

রথীন হেসে বলল, 'পুরনো অভ্যাসের টান। এসেই যখন পড়েছি, চল ভেতরে যাওয়া যাক।'

সেই কফি-হাউস! দরজার মুখে দাঁড়িয়ে জয়া সারাটা হল-এ চোখ বুলিয়ে নিল। সেদিন তাদের যে বয়স ছিল, সেই বয়সের ছেলে-মেয়েরা টেবিলগুলো দখল করে রেখেছে। হঠাৎ উচ্ছসিত কণ্ঠে জয়া বলে উঠল, 'ওই দেখ, দেয়ালের ধারে আমাদের সেই জায়গাটা বে দখল হয়ে গেছে।'

তার কথা শুনে রথীন হেসে উঠল। বলল, 'হবে না? এতকাল পরে এসে কি আর পুরনো অধিকার ফিরে পাওয়া যায়?'

মোটামুটি ফাঁকা দেখে একটা টেবিল তারা বেছে নিল। জয়া বলল, 'আজকের বিল আমার। আমি তোমাকে খাওয়াব।'

'আপত্তি নেই। তখনকার দিনেও বেশির ভাগ সময় এই কাজটা তুমিই করতে—বিশেষ করে শান্তনু আর আমার বেলা!'

'আচ্ছা রথীন, আবার আমরা ফিরে পেতে পারি না আমাদের

সেই উজ্জ্বল আনন্দময় দিনগুলিকে?'

জয়া কি ছেলেমানুষ হয়ে গেল? না কি পরিবেশের প্রভাব? রথীন হালকা কণ্ঠেই বলল, 'ফিরে পেলেও দিনগুলিকে আবার ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করবে। কারণ আমরা সেই মন পা'ব কোথায়—সেই বিশ্বাস সেই ভালবাসা সবই যে আজ আমাদের জীবন থেকে ফুরিয়ে গেছে জয়া—ভাল লাগবে কেন আজকের মন নিয়ে সেই দিনগুলিকে?' রথীন হাসতে হাসতে শুরু করলেও শেষের দিকে কেমন ভারী হয়ে উঠল তার গলা। মুহূর্ত কয়েক কেউ-আর কোন কথা বলল না।

জয়া মাংস আর মোগলাই পরোটার অর্ডার দেয় রথীনের জন্য।

'এ-কী, তোমার জন্য বললে না!' আপত্তি জানায় রথীন।

'আমার একেবারে ইচ্ছে নেই। শুধু কফি খাব।'

'বাড়ি পৌঁছে খেতে গেলে তোমাকে সারাদিন উপোস দিতে হবে।'

'আমার অসুবিধা হবে না।'

রথীন আবার কিছু বলতে গিয়ে জয়ার চোখের দিকে নজর পড়ায় থেমে গেল। ভুল দেখছে না তো সে?

জয়া বুঝতে পেরে বলল, 'শান্তনু আর আমার মধ্যে যা ঘটে গেছে তার জন্য আমি দুঃখ করি না, রথীন। সেটা এড়ানো সম্ভব ছিল না। আমি কষ্ট পাচ্ছি মেয়েটার কথা ভেবে। টুকুন ঠিক তার বাপির মত ইমোশনাল হয়ে উঠেছে। ভাবছি, ওকে আমি সামলাব কেমন করে?'

জয়ার চোখের কোণ ভিজে ওঠে। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে সে চোখ মোছে। রথীন চুপ করে থাকে। ততক্ষণে জয়া নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয়।

রথীন বলল, 'মা আর বাপির ছাড়াছাড়িটা কি তার কাছে কম কষ্টকর ছিল? সেটা যদি সহ্য করতে পেরে থাকে, এও পারবে। ভেবো না।' একটু থেমে রথীন আবার হালকা ভঙ্গীতে বলল, 'তা

ছাড়া ওকে ঘা খেয়ে-খেয়ে শক্ত হতে দাও। যার বাবা-মা দারুণ-দারুণ বিপ্লবী, তখন সে-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?'

খাবার আসে। জয়া বলে, 'আগে খেয়ে নাও।'

'চল না, ভাগ করে খাওয়া যাক।' রথীন জয়ার মুখের দিকে তাকায়।

'বলেছি তো আমার ইচ্ছে নেই। আমি খেলে তো বলতামই।' জয়া মাংস আর মোগলাই পরোটার প্লেট দুটো রথীনের সামনে এগিয়ে দেয়। রথীন মোগলাইটাকে চির-চির করে কাটে ছুরি দিয়ে, তারপর কাঁটায় গেঁথে একটা টুকরো মুখের মধ্যে পোরে। জয়া নিঃশব্দে ওর খাওয়া দেখে।

মাঝে মাঝে নষ্টালজিয়ার ঘোরে মনটা পেছনের দিকে ছুটতে চায়। দেওয়ালের ধারে ওই তো সেই টেবিলটা, যেটাকে ঘিরে বসে জয়া, শান্তনু, রথীন এবং আরো সব বন্ধুরা রোজ আড্ডা দিত, তর্ক বিতর্কের ঝড় তুলতো। তাদের জেনারেশনের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। আজ এসেছে নতুনের দল। কফি হাউস তার ট্র্যাডিশন অব্যাহত রেখেছে। যেখানটাতে শান্তনু আর জয়া বসত, সেখানে বসে রয়েছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তারা একেবারে তন্ময়। আশ-পাশের হট্টগোল যেন তাদের স্পর্শও করতে পারছে না। তাদের সামনে দু কাপ কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে। জয়ারা কিন্তু কফি-হাউসে ঢুকে অমন চুপচাপ বসে থাকতে পারত না। হট্টগোল করাই ছিল তাদের অভ্যাস। অবিশ্যি মাঝে-মধ্যে নিরিবিলিতে যেতে যে ইচ্ছা হত না, তা নয়। কিন্তু সুযোগ ছিল কম। শান্তনু তখন সারা বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের নেতা। কলকাতা ছাড়াও সমস্ত জেলায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হত। নানা কলেজে সংগঠন গড়ে তোলা, সভা-সমিতি, আন্দোলন মিছিল—এ সবের মধ্যে ব্যক্তিগত রোমান্টিক জীবন নিয়ে তন্ময় হ'য়ে থাকার অবসরই বা কোথায়? দু'জন একই আদর্শ নিয়ে

কাজ করছে—এই চিন্তার মধ্যেই তারা পরস্পরের হৃদয়ের সান্নিধ্য গভীরভাবে অনুভব করত। দৈনন্দিন জীবনের কর্মযজ্ঞে তাদের ভালবাসার শতদল বিকশিত হয়ে উঠেছিল। জয়ার মনে পড়ে, একবার বিরোধী দলের ছাত্ররা তাদের একটা সভায় ইটপাটকেল ছুঁড়ে সভা পণ্ড করতে চেষ্টা করেছিল। একটা ইটের টুকরো এসে লেগেছিল শান্তনুর কপালে- কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছিল—তবু সে বক্তৃতা বন্ধ করতে চায়নি। কিন্তু তার কপালের রক্ত দেখে জয়ার যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে সে ছুটে গিয়ে শান্তনুকে জাপটে ধরে মাইকের সামনে থেকে জোর করে নিয়ে এল। পরে অবিশ্যি এই জন্য তাকে তার কাছে তিরস্কৃত হতে হয়েছিল। সে বলেছিল, 'তুমি একটা নাটুকে কাণ্ড করে বসলে। ওদের বিরুদ্ধে এজিটেশনের কেমন একটা সুযোগ নষ্ট হল বলত?' জয়া নিঃসঙ্কোচে জবাব দিয়েছিল, 'থাক এজিটেশন। তোমার কপাল কেটে এত রক্ত ঝরছে—আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব! তা কখনো হয়?' শান্তনু সেদিন মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে জয়ার দিকে তাকিয়েছিল। এক সময় সে বলল, 'এরই নাম বোধ হয় ভালোবাসা'। দু'জনই হেসে ফেলল। ঘটনাটা কিছুদিন ছাত্র-ছাত্রী মহলে সরস আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিরোধীপক্ষও ছাড়েনি। তারা ব্যঙ্গ ছড়া আর ছবির পোস্টার লাগিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে।

কফি এল পটে করে। দু'টো কাপে জয়া কফি ঢালল, চিনি ও দুধ মিশিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে একটা কাপ রথীনকে দিল। নিজে নিল একটা।

'আচ্ছা রথীন, শান্তনুর ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? এ কাজ কারা করেছে বলে তুমি মনে কর?' জয়ার গভীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রথীনের মুখে আবদ্ধ।

'বলা মুশকিল। পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণে কাবু হয়ে

পড়ে গিয়েছিল। সেও চিনতে পারেনি। অথবা চিনে থাকলেও এখন পর্যন্ত কারুর নাম বলে নি।'

'কিন্তু তোমাদের কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে, আমাদের লোকরাই এ কাজ করেছে। প্রমাণ ছাড়া কি এভাবে লেখা ঠিক?'

'প্রমাণ নেই সত্যি তবে একেবারে অসম্ভবই বা বলা যায় কেমন করে? তা ছাড়া প্রচারের সুযোগ কে না নেয়? তোমরাও অনেক নিয়েছ।' বলে রথীন একটু থামে। পরে আবার বলতে শুরু করে, 'ব্যক্তিগত ভাবে কে বা কারা শান্তনুকে ছোরা মেরেছে, সেটা বড় কথা নয়। আজকের আসল সমস্যা খুনোখুনির রাজনীতি। এ ব্যাপারে তোমাদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা কি ঠিক হবে?'

'আমাদের কত ছেলেকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তুমি জান?'

'জানি। তেমনি অন্য দলের লোকরাও দিচ্ছে। শান্তনু তো এই সন্ত্রাসী রাজনীতির ঘোর বিরোধী—তাকে কেন আজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হচ্ছে? যারাই এ কাজ করে থাক তারা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি ছাড়া ভাল করেনি।'

জয়া কিছুক্ষণ কথা বলে না। এক সময় সে বলল, 'যে ভাবে দিন-দিন এ সব বেড়ে চলেছে এর শেষ কোথায় কে জানে!'

'শেষ আমাদের সবার সর্বনাশের মধ্যে', রথীন জবাব দেয়, 'বিপ্লবের শত্রুরা এর সুযোগ নিচ্ছে।'

জয়া বলল, 'থাক এ-সব আলোচনা। ভাল লাগছে না। চল এখন ওঠা যাক।'

জয়া বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে।

তারা হাসপাতালে এসে দেখল অপারেশন এইমাত্র শেষ হয়েছে। শান্তনুকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ঘরে নিয়ে রাখা হয়েছে। দেখা করা চলবে না।

রথীন বলল, 'এখন বাড়ি ফিরবে তো?'

'দাদার বাড়ি হয়ে ফিরব। টুকুনের খবর নেওয়া দরকার।'

'চল, তোমাকে বাস-এ তুলে দিয়ে আসি।'

রথীন বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তার সঙ্গে এল। পর-পর দু'টো বাস চলে গেল—ভিড়ের জন্য উঠতে পারল না জয়া।

'কি করবে? ট্যাক্সিতেই চলে যাও। আজ সারাদিন খুব স্ট্রেন গেছে তোমার।'

'আমার আর কি স্ট্রেন: যা করার তোমরাই তো করেছ।'

রথীন একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। ভেতরে গিয়ে বসে জয়া মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ও কেমন থাকে, খবরটা কেমন করে পাব? কাল সকালে কি আসছ হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ। দু'তিনদিন সব সময় লোক থাকবে।'

'আমি সম্ভব হলে আসব।'

রথীন মৃদু হেসে জয়াকে বিদায় জানাল।

৩

জয়ার জীবনে আজ শান্তনুর কোন স্থান নেই। অথচ একদিন ছিল। সেদিন হলে এ-অবস্থায় তাকে ফেলে বাড়ি ফেরার কথা হয়ত সে ভাবতে পারত না। না থাক কোন সম্পর্ক আজ তার সঙ্গে। তবু জয়া চায়, তার জীবনের ফাঁড়া যেন কেটে যায়। সে যেন ভাল হয়ে ওঠে। টুকুনের জন্যই তার বেঁচে থাকা দরকার। মেয়েও হয়েছে তেমনি। বাপি ছাড়া কথা নেই। কি বিপদেই না পড়তে হয়েছিল জয়াকে শান্তনুর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ির সময়।

'টুকুনকে আমি আমার সঙ্গে নেব।' দাবি করে বসল শান্তনু।

'পাগল হয়েছ?' বলল জয়া, 'তিন বছরের একটা শিশু মা-ছাড়া থাকতে পারে?'

'খুব পারবে। আমি সব-সময়ের লোক রাখব।'

'না. আমি টুকুনকে দেব না।'

কিছুতেই রাজি হয়নি জয়া। শান্তনুর মুখের চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেল। সে বলল, 'টুকুনের সঙ্গে আমার দেখা হবে কেমন করে? না কি সেটাও তুমি চাও না?'

'সে আমি পরে তোমাকে জানাব।'

রাত্রে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে টুকুন আনন্দে হৈ চৈ শুরু করে দিল।

'জান মামণি, বাপি আজ আমার জন্য কত কি এনেছে—কত খেলনা—কত জামা—আরো কত জিনস! দেখবে এসো।' মাকে হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে আসে টুকুন।

'কি ব্যাপার? এত এত উপহার! আজ তো তোমার জন্মদিন নয়—তবে?'

'বাঃ রে—জন্মদিন না হ'লে বুঝি দিতে নেই?'

শোবার ব্যবস্থা আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে থেকে। জয়া মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। রাজুর মা ঘরে ঢুকে বলল, 'তুমি কি খাবে না দিদিমণি? কত রাত হল!'

'দাদাবাবু খেয়েছেন?' প্রশ্নটা নিরর্থক। দু'জন বাড়িতে থাকলে এখনো তারা একসঙ্গে বসেই খায়।

রাজুর মা বলল, 'দাদাবাবু খাবেন না।'

'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।'

জয়া শান্তনুর ঘরে এসে দেখল, সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। সাধারণতঃ অনেক রাত জেগে তার পড়াশুনার অভ্যাস। এর ব্যতিক্রম

নেই। তাই একটু অবাক হল সে।

'ঘুমিয়ে পড়েছ ?'

'না।' শান্তনু উঠে বসল।

'রাজুর মা বলছিল, তুমি খাবে না !'

'হ্যাঁ।'

'খাবে না কেন ?'

'একটু জ্বর-জ্বর ভাব— ফাস্ট দিলে হয়ত ঠিক হ'য়ে যাবে।' আগে হ'লে জয়া নিজের হাতে তার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করত। আজ আর তা করা চলে না।

'ঠিক আছে। তবে শু'য়ে পড।'

জয়া ঘর থেকে বেরুতে যাবে, পেছন থেকে শান্তনুর ডাকে ফিরে দাঁড়াল।

'শোন, জয়া। আমি কাল চলে যাচ্ছি।'

'কালই যাবে! তোমার শরীর অসুস্থ বলছ—'

'তাতে অসুবিধা হবে না। আমার যাবার সময় টুকুনকে নিয়ে তুমি কোথাও চলে যেয়ো। ও সামনে থাকলে কান্নাকাটি করবে।'

জয়া হঠাৎ যেন কেমন বোবা হ'য়ে গেল।

সেদিন আর কোন কথা হয়নি। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছিল সে। পরদিন টুকুনকে নিয়ে সকাল সকাল সে চলে এল মা-এর কাছে—তাদের দেশপ্রিয় পার্কের বাড়িতে।

মা সব শুনে কেঁদে ফেললেন। তাঁর এক কথা, 'তোরা শুধু নিজেদের জেদটাকে বড় ক'রে দেখলি। মেয়েটার কথা একটু ভাবলি না !'

'আমি ওর কোন অভাব রাখব না।' জয়া বলল।

মা রেগে গিয়ে বললেন, 'লেখাপড়া শিখে এই বুঝি তোর বুদ্ধি ! যতই করিস, তুই ওর বাপের অভাব মেটাতে পারবি ? ওরে,

বাপ-মা'র স্নেহ ভগবানের দান। একজনকে দিয়ে আর একজনের অভাব মেটানো যায় না।'

মেয়ের কথা ভেবে জয়ার নিজেরও যে খারাপ লাগেনি, তা নয়। কিন্তু উপায় ছিল না। তা ছাড়া তখন মাথায় জেদ চেপে গেছে। আর সরে আসার কোন প্রশ্ন নেই। অযথা সেন্টিমেণ্টকে প্রশ্রয় দেবে না সে।

সেদিন বড়দাও এসেছিলেন বাড়িতে। সব শুনে একটু গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'দেখ, দাম্পত্যজীবনের প্রবলেম সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তবু বলছি, শুধু রাজনৈতিক বিরোধের জন্য এই স্টেপ নেওয়ার আগে তোদের আরো ভাবা উচিৎ ছিল। তোদের সম্পর্কটাও অনেকদিনের। তবে একটা অ্যাডজাষ্টমেণ্ট ক'রে নিতে পারলি না কেন?'

'তুমি কি মনে কর সে-চেষ্টা হয়নি? এখন আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছি না। এ অবস্থায় কি একসঙ্গে থাকা যায়?' জয়া বলতে চেয়েছিল 'আমরা আর কেউ কাউকে ভালবাসি না,' কিন্তু দাদাকে কথাটা বলতে তার বাধল।

বড়দা বরাবরই সংসার থেকে আলাদা। বিয়ে করেননি। সংসারের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মাথাও ঘামান না। তাঁর পক্ষে জয়ার সমস্যাগুলি অনুধাবন করা কঠিন।

জয়া আরো বলল, 'তা ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক বিরোধ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি কি মনে কর, অ্যাডজাষ্টমেণ্টের আর কোন স্কোপ আছে? শান্তনু তো সরাসরি আমাদের শত্রু ক্যাম্পের লোক এখন।'

তার কথা শুনে বড়দা একটু হাসলেন। তিনি কী ভেবেছিলেন, কে জানে? শুধু বললেন, 'এত সীরিয়াসলি নিতে গেলে আজ প্রত্যেকটা পরিবারের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হ'য়ে যাবে রে। এমন একটা

পরিবারও কি দেখাতে পারিস, যেখানে দু'তিন রকমের রাজনৈতিক মত নেই? স্বামী-স্ত্রী দু'জন দুই পার্টি করে—আমাদের মধ্যেই অনেক রয়েছে।'

জয়া চুপ করে ছিল। জবাব দেয়নি। বড়দা তাঁর শেষ কথা বললেন, 'এত ধৈর্যহীন হলে চলে? এমন তো হতে পারে, ভবিষ্যতে শান্তনুর রাজনৈতিক মতের পরিবর্তন ঘটবে এবং সে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে। তখন? তখন কি করবি তোরা?'

বড়দার যে কি আশা! শান্তনু পাল্টাবে তার মত—তবেই হয়েছে! পার্টি দু'ভাগ হবার পর জয়া কি সে চেষ্টা কম করেছে?

ছোট্দা কিন্তু জয়াকে খুব সমর্থন করেছিল। অথচ রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বাবার মৃত্যুর পর সেই এখন সংসারের কর্তা। বড় চাকরি। সব দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে।

ছোট্দা বলল, 'ঠিক করেছিস। কনজুগাল লাইফে যদি হারমোনি না থাকে, তবে সেটাকে টিকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। ডিভোর্স-স্যুট ফাইল ক'রে দে। আমার এক বন্ধু ল' প্র্যাকটিস করে—তাকে বলে দেব'খন।' ছোট্দা সে-ভাবেই জয়াকে সাহায্য করেছিল।

ছোট-বৌদি তখন কিছু বলেননি। পরে বলেছিলেন, 'আসল কারণটা কী বলতো ভাই! আর কারুর সঙ্গে অ্যাফেয়ার চলছে নাকি? তোমাদের খুব সুবিধা! গাদা-গাদা পুরুষমানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রচুর স্কোপ। আমারই মাঝে মাঝে তোমাদের পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছে করে।'

বৌদির কথার জবাব দেয়নি জয়া। ঘেন্না লেগেছিল তার কথা শুনে। ছোট্দা কোথা থেকে যে একটা মোমের পুতুল জুটিয়ে এনেছে! একেবারে আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সুখ-সুবিধা, আরাম, বিলাস ছাড়া আর কিছু মাথায় নেই। দিন-রাত কসমেটিক মেখে পরী হ'য়ে থাকা, শাড়ি কেনা, ঘর সাজানো আর সিনেমা দেখা—এর মধ্যেই তার

জীবন। প্রথম থেকেই জয়ার সঙ্গে তেমন ভাব নেই তার।

ট্যাক্সিটা ল্যান্সডাউন রোড ধরে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে আসতেই জয়া বলল, 'এসে গেছে। এইখানেই দাঁড় করান।' ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে নেমে পড়ল। কিছুটা হেঁটে গিয়ে একটা মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনল টুকুনের জন্য। তারপর হাঁটতে হাঁটতে দাদার বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। কলিং বেল টিপতে হাত কাঁপল একটু। মেয়েটা এর মধ্যে খবর পেয়ে যায়নি তো ? তা হলেই হয়েছে!

মাকে দরজা খুলতে দেখে জয়া বলল, 'মা, টুকুন কি ইস্কুল থেকে ফিরেছে ?

'হ্যাঁ। খেতে বসেছে।' জয়ার মুখের চেহারা দেখে বোধহয় তাঁর সন্দেহ হল। বললেন, 'তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন ?'

'তোমরা শান্তনুর কিছু খবর শুনেছ ?

'না তো। কি হয়েছে তার ?'

'ও হাসপাতালে আছে। দিন চারেক হল কা'রা তাকে খুব মেরে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল।'

মা-এর মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসছিল জয়া বাধা দেয়, 'কি করছ মা! টুকুন টের পাবে! ওকে এখন জানাবার দরকার নেই।'

'ওর কাছে চেপে রাখতে পারবি ? প্রতি রবিবার শান্তনু ওকে দেখতে আসে—এই রবিবার বাদ গেছে—এই নিয়ে তোর মেয়ে সারাক্ষণ প্রশ্ন করছে, বাপি কেন এল না ?'

'ভেবে একটা উপায় বের করা যাবে। তার আগে আমাকে কিছু খেতে দাও। দুপুরে খাওয়া হয়নি।'

জয়া মা'র সঙ্গে ভেতরে এল। টুকুন মাকে পেয়ে খুব খুশি। সে বাপির সম্পর্কে অভিযোগ করে বলল, 'জান মামণি, বাপি রবিবারে

আসে নি। এবার এলে আমি আড়ি করে দেব।'

জয়া হেসে বলল, 'তাই করো। তবে তোমার বাপির তো অনেক কাজ—হয়ত বাইরে কোথাও গেছে।'

'বাঃ রে—আমাকে বলে যেতে পারল না?' অভিমানে তার চোখে প্রায় জল এসে যায়। জয়া মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দুটি আয়ত চোখ, উজ্জ্বল দৃষ্টি. ফর্সা রং, লম্বা রোগাটে গড়ন। মুখখানা দেখতে ঠিক বাপির মতন। শুধু গায়ের রং আর দেহের গড়নই জয়ার মত। তার কাছে আশ্চর্য লাগে এই সৃষ্টি! একটি মানুষের অবয়বে দুজন মানুষের প্রতিচ্ছায়া!

জয়া বলল, 'মামণি, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমি চানটা সেরে আসি আগে।'

মা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'টুকুন, তোমার ছোট মামীর একটা শাড়ি এনে মাকে দাও।'

টুকুন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ছোট মামীর শাড়ি কেন? আমারই তো রয়েছে।' সে চটপট আলমারির ভেতর থেকে একটা শাড়ি বের করে আনল। লাল সিল্কের শাড়ি। জমিন জুড়ে ফুল আর লতাপাতা। জয়া অবাক। টুকুন আবার শাড়ি পরতে শুরু করল কবে থেকে? সে তো কখনো কিনে দেয়নি তাকে।

'বাপ-মেয়ে দুজনই সমান!' আসল রহস্য মা ভাঙলেন। 'ইস্কুলের ফাংশনে টুকুন বন-পরী সাজবে। এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে শাড়ি পরে দেখেছিল মানায় কিনা। খুব নাকি মানিয়েছিল। তাই শুনে বাপ গিয়ে মেয়ের জন্য এই দামী শাড়িখানা কিনে আনল। আমি খুব বকেছি। মেয়ে যা চাইবে তাই দিতে হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে টুকুন প্রতিবাদ করল, 'বাঃ রে—আমি কি বলে-ছিলাম? বাপি নিজেই তো আনল।'

'হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছেটা যেন বাপি টের পায়নি! শোন মেয়ের

আরো কাণ্ড! বায়না ধরেছে পূজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবে। বাপও সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বলেছে—কাশ্মীরে নিয়ে যাবে।'

জয়ার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে বলল, 'টুকুন, অবুঝ হয়ো না। তুমি এখন বড় হচ্ছ -আমি সঙ্গে না থাকলে তোমার কোথাও যাওয়া হতে পারে না।'

টুকুনের মুখ বিষন্ন হয়ে ওঠে। সে বলল, 'তা হলে তো আমার কোনদিন কোথাও যাওয়া হবে না।'

'কেন? আমার সঙ্গে যাবে।'

'না।'

'না কেন?'

টুকুন নিরুত্তর! জয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'বল, আমার সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি কিসের?'

'আমি কি বলেছি তোমার সঙ্গে যাব না? তোমার সঙ্গে আঙ্কল থাকলে আমি যাব না।' বলেই টুকুন মাথা নিচু করে রইল।

এই ব্যাপার! মুহূর্তে জয়ার মাথায় রক্ত ওঠে যায়। সে ভেতরের রাগ যথাসম্ভব সংযত করে বলে ওঠে. 'কেন, সে সঙ্গে থাকলে তোমার কি অসুবিধা?' টুকুনের মুখে কথা নেই। জয়া বলল, 'জবাব দিচ্ছ না যে?'

তবুও টুকুন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব দিল না।

'টুকুন!' জয়া তার রাগ আর চেপে রাখতে পারে না, 'তুমি আজকাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছ। আগে এমন ছিলে না।' বলেই সে আর দাঁড়াল না। বাথরুমের দিকে চলে গেল।

টুকুনও স্তম্ভিত। মা এর কাছে এ-ভাষায় বকুনি খাওয়ার অভ্যাস তার নেই। সহ্য করতে পারল না সে। ছুটে গিয়ে নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

৪

স্নান সেরে জয়া বেরিয়ে এল। ততক্ষণে তার রাগ পড়ে গেছে। সামনে মাকে পেয়ে সে বলল, 'মা, টুকুন কোথায়?'

মা বললেন, 'ওর ঘরে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। ওকে এ-ভাবে তুই বকতে গেলি কেন? ওর কী দোষ—এ-রকম যে হবে, সে তো জানাই ছিল।'

জয়া মা-এর কথার জবাব দিল না। নিঃশব্দে বসে খেয়ে নিয়ে মেয়ের ঘরে এল। টুকুন চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। জয়া তার পাশে শুয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে আনে। অমনি শুরু হয়ে যায় তার ফোঁপানো। জয়ার মনটা বিষাদে ভরে ওঠে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। কান্না পেয়ে যায় তারও। একটু পরে সে মেয়ের কপালে আদর করে চুমু খেয়ে বলে, 'লক্ষ্মীটি মামণি আমার, আর কখনো অমন বলোনা।'

'বলব না।' টুকুন বলে, 'মামণি, আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি—'

'না না—ওটা আমি এমনি রাগ করে বলেছি। আমার মামণি খুব লক্ষ্মী। খুব ভালো।' বলতে বলতে মেয়েকে নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জয়া।

'না. মামণি—আমি জানি. আমি খারাপ হয়ে গেছি।' টুকুনের কথা শুনে জয়া অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। টুকুন বলতে থাকে, 'আমার ইস্কুলের বন্ধুরা তাদের বাড়ির কত গল্প করে। তাদের মা-বাপির গল্প, ভাই-বোনদের গল্প। ছুটিতে তারা কত জায়গায়

বেড়াতে যাবে এ-সব গল্প। শুনে আমার খুব হিংসে হয়। কান্না পায়। তখন আমি খারাপ হয়ে যাই। মনে মনে আমি তোমাকে বকি—আঙ্কলকে বকি।'

'তোমার বাপিকে বুঝি বকনা!'

'বাপিকে বকতে আমার ইচ্ছে হয় না।'

জয়া নতুন করে অনুভব করে টুকুনের অন্তর্বেদনা। একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে সে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তার টুকুন? ধীরে ধীরে সে বড় হচ্ছে। বুঝতে শিখছে। নানা প্রশ্ন এখন তার মনে জাগবে।

আগে পার্থর সঙ্গে টুকুনের যথেষ্ট ভাব ছিল। কিন্তু তার এ বাড়িতে আসার পর থেকে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মেয়ের মনে এত জটিলতা দেখা দেবে, জয়া আগে ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। আগে বুঝতে পারলে জয়া কিছুতে নিজের সুখের জন্য টুকুনের সমস্ত সুখ আনন্দ নষ্ট হতে দিত না। টুকুনের চেয়ে আপন আর কে আছে তার। তাকে সুখী করতে সে যে-কোন দুঃখ মেনে নিতে পারে।

জয়ার মনে পড়ে প্রথম অসুবিধা দেখা দিয়েছিল শোয়ার ব্যাপার নিয়ে। টুকুন দারুণ ভাবে বেঁকে বসল, আঙ্কলকে মা-এর ঘরে শুতে দেবে না। কান্নাকাটি শুরু করে দিল সে। শেষ পর্যন্ত পাশের ঘরে পার্থর শোয়ার ব্যবস্থা করতে হল। যেমন সে আগে শু'ত।

হাসতে হাসতে পার্থ বলেছিল, 'টুকুন ঠিকই বলেছে। টুকুন ছাড়া ওর মার সঙ্গে আর কেউ শুতে পারে না।'

সেদিন জয়া দারুণ অপ্রস্তুত হয়েছিল—পার্থ এবং মেয়ে, দু'জনের কাছেই। টুকুন যেন তার বিশেষ অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছিল তার বাপির অধিকারগুলো এক-এক করে পার্থর দখলে চলে যাচ্ছে। এটা তার সহ্য হল না। সেই থেকে সে পার্থর ওপর দারুণ

ভাবে বিরূপ হয়ে উঠল। পার্থ অনেক চেষ্টা করেও আর তার হৃদয় জয় করতে পারে নি। এত ঈর্ষাও থাকতে পারে একটা ছোট্ট মেয়ের মনে! ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিল জয়া।

রাজুর মা বলত, 'তোমরা যখন বাড়ি থাক না, তখন টুকুন গুমড়ে-গুমড়ে কাঁদে। ওর কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারি না গো দিদিমণি!'

জয়া নিঃশব্দে শুনেছে শুধু। জবাব দেয় নি।

তারপর ঘটল সেই ঘটনা। জয়ার এখনো ভাবতে লজ্জা লাগে। তারও বোধ হয় কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, নইলে কেউ অমন অসাবধান হয়? টুকুন ঘুমুলে প্রায়ই সে চলে আসত পার্থর ঘরে। সেদিনও সে এসেছিল। দরজার সিটকিনি লাগাবার কথা মনে হয়নি। হঠাৎ সে চমকে উঠল টুকুনের ডাকে। সে বিছানায় মাকে দেখতে না পেয়ে সরাসরি এসে হাজির হল পার্থর ঘরে। তার 'মামণি' ডাক শুনে জয়া ও পার্থ মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে দু'দিকে সরে গিয়ে নিজেদের সামলে নিল। অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে যেতেই রাগে কাঁপতে লাগল জয়া। পার্থ না আটকালে সে মেরেই বসত। কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা প্রচণ্ড ধমক লাগাল তাকে, 'পাজী মেয়ে! উঠে এসেছ কেন? ও ঘর থেকে আমাকে ডাকতে পার নি?'

টুকুন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মা-এর রাগ দেখে সে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'ডেকেছিলাম মামণি! তুমি শুনতে পাওনি। আমার বড্ড ভয় করছিল।' কী অসহায় দৃষ্টি তার চোখে! সহ্য করতে পারেনি জয়া—এগিয়ে এসে মেয়েকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। নিজের নিষ্ঠুরতার অনুশোচনায় মরে যেতে ইচ্ছে হল তার। সেই দিন থেকে শুরু হল তার ভেতরকার দুটো সত্তার দ্বন্দ্ব।

পরদিন জয়া মেয়েকে নিয়ে মা-এর কাছে এল। তিনি বললেন,

'আমি জানতাম এমনটি হবে। আমার আপত্তি তখন কানে তুলিসনি। যা হয়ে গেছে আর ফেরানো যাবেনা। টুকুন এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে।'

টুকুনকে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে গেল।

একটা বৈত্যুতিক শক লাগল জয়ার বুকে। এই তার মেয়ে যার জন্য তার ভাবনার শেষ নেই—বুকের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে যাকে সে এতদিন লালন-পালন করেছে, এক কথায় সে রাজি হয়ে গেল তাকে ছেড়ে আসতে!

'টুকুন, তোর মন এত কঠিন!' বলল জয়া। টুকুনের চোখ দু'টিও তখন সজল হয়ে উঠেছে, সে নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

'মামণি, তোমার জন্য আমার খুব কান্না পাবে।' বলেই হঠাৎ সে মা-এর বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্না-ভাঙা স্বরে সে বলতে লাগল, 'মামণি, আমি তোমাকে, বাপিকে খুব ভালবাসি। বাপির জন্য সব সময় আমার কান্না পায়।'

সেদিন থেকে মা আর মেয়ের মাঝখানের মেঘ সরে গেল। একদিন জয়া এসে হাজির হল শান্তনুর কলেজে। সে ক্লাশে ছিল। রথীনের সঙ্গে দেখা হল প্রফেসরস রুমে। অনেক দিন পরে তার সঙ্গে দেখা। দু'জনে অনেক কথা হল।

জয়া একসময় জিজ্ঞেস করল, 'শান্তনুর খবর কি? সে বিয়ে-টিয়ে করছে না কেন? করবে না?'

'জানি না।' হালকা ভাবেই জবাব দিল রথীন, 'হয়ত তোমার মতন আর একজন পাত্রীর সন্ধান মিলছে না বলেই করছে না।'

'তা হতেই পারে না,' জয়াও হাসতে হাসতে বলল, 'আমি জানি, এমন ভুল আর সে করবে না। কিন্তু কেতকী তো রয়েছে! সে তাকে এখনো ভালোবাসে—যে জন্য সে আর বিয়েই করল না।

শান্তনুর উচিৎ তাকেই বিয়ে করা। এক দলের লোক—অশান্তির ভয় নেই।'

'এক দলের হলে বুঝি অশান্তি থাকে না? আমার সঙ্গে আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে এসো—দেখবে। মাঝে মাঝে আমাদের ভয় হয়, এই বুঝি কোর্ট পর্যন্ত গড়াল।'

'তবুও গড়ায় না তো! এক দল বলেই এইটুকুতে এসে থেমে যায়।'

দু'জনই হেসে ওঠে।

জয়া আবার তার পুরনো প্রশ্নের জের টেনে বলল, 'কেতকীর কথাটা কিন্তু আমি সীরিয়াসলি বলেছি। আমি জানি, আগে তার ওপর শান্তনুরও কিছু দুর্বলতা ছিল। তুমিও জান সেটা।'

রথীন বলল, 'একদিন আমি ওকে বলেছিলাম, জয়া আবার বিয়ে করতে পেরেছে, তুমি করবে না কেন?'

'কী জবাব দিল সে?'

'জবাব দেয়নি। হাসল শুধু। আসলে ও খুব ইমোশনাল। শকটা সামলে উঠতে একটু সময় লাগবে তার।'

'এটা হচ্ছে ওর চরিত্রের কনট্রাডিকশন। মুখে বস্তুবাদী, কিন্তু কাজের বেলা উল্টো।' তবুও জয়ার ভালো লাগল কেন খবরটা শুনে? শান্তনু বিয়ে করবে কিনা সেটা তার ব্যাপার। জয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তবে কি এখনো তার প্রতি কোন দুর্বলতা আছে নাকি? না—নিজের মনেই দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করল সে। পার্থকে নিয়ে আমি সুখী। তাকেই আমি ভালোবাসি। শান্তনুর চ্যাপ্টার ক্লোজড। সে শুধু টুকুনের বাপি।

শান্তনু কমন রুমে ঢুকে জয়াকে দেখে বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। কি বলবে হঠাৎ যেন ভেবে পায়নি। জয়ার অবস্থাও অনেকটা তাই। তবুও সে বলল, 'তোমার কি আর ক্লাশ আছে?'

'না। কেন?' বলল শান্তনু। জয়া ঠিক বুঝতে পারে। বোধ হয় শান্তনু একটু নারভাস বোধ করছে। ওর গলার স্বরেই তার আভাস।

'তা হলে আমার সঙ্গে একটু চল। কথা আছে।' শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল জয়া। তারপর রথীনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। যেতে যেতে শান্তনু জিজ্ঞেস করল, 'টুকুন কেমন আছে?'

'ভাল।'

'আশাকরি, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই আমার কথা ভুলতে পেরেছে।'

'আমাকে মাপ কর শান্তনু। আজ আমি তোমাকে নিতেই এসেছি। টুকুন তোমাকে ভোলেনি। আমিও তা চাই না আর।'

হঠাৎ জয়ার খেয়াল হল তার বুকে মুখ গুঁজে কখন টুকুন ঘুমিয়ে পড়েছে। ক'টা বাজল এখন? সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর দেরি করা চলে না। জয়া আলতো ভাবে মেয়ের মাথাটা বালিশের ওপর পেতে দিয়ে উঠে পড়ল। এক্ষুণি তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। পার্থ হয়ত রেগে আগুন হয়ে আছে। আর জটিলতা বাড়িয়ে কাজ নেই। কেমন ক্লান্ত বোধ করে জয়া। মানসিক অবসাদ। তাড়াতাড়ি শাড়িটা পাল্টে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

৫

বাস থেকে নেমে জয়া একটু অবাক হল। অন্যদিন এই সময় রাস্তার মোড়ে অনেক লোকজন থাকে। ছেলেরা দাঁড়িয়ে জটলা করে। আজ ন'টার মধ্যে মোড় একেবারে জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ। ব্যাপার কি? কয়েক পা এগোতেই জয়ার নজরে পড়ল, অন্ধকারে একটা দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'টি ছায়ামূর্তি, তাকে দেখে তারা তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

'ভয় নেই—আমরা, জয়াদি!' একজন ছায়ামূর্তি আশ্বস্ত করে জয়াকে। 'কে তোমরা?' প্রশ্ন করে জয়া।

জয়ার মনোভাব বোধ হয় বুঝতে পারে তারা। তাদের মাথার আচ্ছাদন সরে যায়। এখন মুখ দেখে চিনতে পারল জয়া। রাখাল আর বাবলু।

'কি ব্যাপার! আজ কিছু ঘটেছে নাকি?' দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করে জয়া।

'হ্যাঁ।' বাবলু বলল, দাঁড়াবেন না। যেতে-যেতে কথা বলুন। আমরা আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। পার্থদা বলেছিল আসতে।'

চলতে চলতে জয়া বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু কী ঘটেছে সেটা তো বলবে!'

'আজ তপনের ওপর অ্যাকশন হ'য়ে গেল।' রাখালের সংক্ষিপ্ত জবাব।

অ্যাকশন! তপনের ওপর! জয়া একেবারে স্তব্ধ। বোধহয় সে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাবলু বলল, 'দাঁড়াবেন না জয়াদি। যে-কোন সময় বদলা নিতে ওরা হামলা করতে পারে। আজ সন্ধ্যার দিকেও করেছিল। এই জন্যই তো দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।'

আর কোন কথা নেই কারো মুখে। নিঃশব্দে তিনজন পথ চলতে লাগল। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোও নিঝুম। মানুষ কী ভাবছে এ-সব দেখেশুনে? বুঝবার উপায় নেই। কেউ মুখ খোলে না।

বাড়ির কাছে এসে জয়া বলল, 'ঠিক আছে—আর তোমাদের আসার দরকার নেই।'

'তা হলে আমরা যাই, জয়াদি।' বাবলু বলল। তারপর ডানদিকের সরু রাস্তাটা ধরে অন্ধকারের মধ্যে দু'জন মিলিয়ে গেল।

ঘরের সামনে এসে দরজায় নক্ করল জয়া। ভেতর থেকে রাজুর মা সাড়া দিল—'কে?'

'আমি। দরজা খোল রাজুর মা।'

'দিদিমণি!'

'হ্যাঁ।'

লোক বা গলার স্বর সঠিক না চিনে দরজা খুলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে রাজুর মাকে। নিরাপত্তার জন্যই এর প্রয়োজন। অতর্কিতে ছদ্মপরিচয়ে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে হামলার ঘটনা এ-এলাকায় কম ঘটেনি। আজকের বেপরোয়া রাজনীতির এই হল পরিণতি!

জয়া ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, 'দাদাবাবু বাড়িতে নেই?'

'না। তিনি তো অফিস থেকে ফিরেই বেরিয়ে গেছেন। সন্ধ্যার পর লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন তুমি ফিরেছ কিনা।'

'এক কাপ চা কর। বড্ড মাথা ধরেছে।'

রাজুর মা রান্না-ঘরের দিকে যায়। জয়া শাড়ি-ব্লাউজ ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে। চোখ দু'টো ভীষণ

জ্বালা করছে। আজ ঘুমুতেই হবে। এই জন্য ঘুমের ট্যাবলেট কিনে এনেছে জয়া।

ঘুম হয় না শুনে মা অবাক হয়ে বলেছিল, 'বলিস কি,—তোর ঘুম হয় না!'

'কি করব,– হচ্ছে না তো!' ইতস্তত: করে বলেছিল জয়া।

'ঘুমের আর কী দোষ!' একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা মন্তব্য করেছিল, 'জীবনটাতে এমন জট পাকিয়ে ফেলেছিস—ঘুম হবে কি করে?' পার্থও সেদিন এই ধরনের কথাই বলেছিল না? কমপ্লেক্স!

'জট কোথায় দেখলে মা? আমি তো বেশ আছি।'

'বেশ থাকলেই ভাল, বাপু!'

জয়া বুঝতে পারে মা-এর দুশ্চিন্তার কারণ। তাঁর ভয়, সত্যিই সে সুখী হতে পারল কিনা। আসলে তাঁর এই আশঙ্কার মূলে রয়েছে সংস্কার। একবারের বেশি মেয়েদের বিয়ে হতে পারে না, হলেও তারা সুখী হয় না—এই কুসংস্কার অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে কঠিন বৈকি!

রাজুর মা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে জয়া কাগজটা টেনে নেয়—কিন্তু হেডিংগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দেয়। ভাল লাগছে না। কিছুতেই ভেতরের অস্থিরতা চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছেনা তার পক্ষে। তপনের মুখটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। চলতি রাজনীতির পরিভাষায় অ্যাকশনের মানে একটাই। জয়া বুঝতে পারে তপন আর বেঁচে নেই। একবার সে তার জীবন রক্ষা করেছিল। তবুও শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে থাকতে পারল না। পারল না নয়, তাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হল না। জয়ার মনে এই আশঙ্কাই ছিল তার সম্পর্কে।

একদিন ইউনিট-সেক্রেটারী সুব্রত এসে জয়াকে বলেছিল, 'জয়াদি, আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'বেশ তো, বল।'

'তপন আপনার কাছে প্রায়ই আসে। তার সম্পর্কে আপনার কী স্টাডি?'

সুব্রত একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নটা রাখলেও তার উদ্দেশ্য বুঝতে জয়ার অসুবিধা হয় নি। সে মনে-মনে হেসে বলল, 'তুমি তার সম্পর্কে কী জানতে চাও, সরাসরি বল।'

বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল সুব্রত। মৃদু হেসে সে বলল, 'তার মুখোসটা ধরা পড়েছে এতদিনে। সে গোপনে চরমপন্থীদের হয়ে কাজ করছে অনেক দিন থেকে—আপনি সে-খবর রাখেন?'

'খবরের সত্যতা তোমরা যাচাই করেছ?'

'হ্যাঁ। আপনার সন্দেহ আছে?'

জয়া জানে তপনের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। তার ধারণা, পার্টি আর বিপ্লব চায় না। নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রীত্বের স্বপ্ন দেখছে। সুখ আর আরামের পথ ছেড়ে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার মানসিকতা আর তাদের নেই।

জয়া বলল, 'নীতিগত ব্যাপারে তার মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই নিয়ে তার সঙ্গে তোমরা আলোচনা করছ না কেন?'

'লাভ নেই আর।' তীব্রকণ্ঠে সুব্রত বলে উঠল, 'জানেন, সে আমাদের কত ক্ষতি করেছে? বেশ কিছু কমরেডকে সে বিভ্রান্ত করেছে। তারা এখন আমাদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তপন সম্পর্কে আরো আগে আমাদের সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল। দুঃখের বিষয়, কেউ-কেউ তার সম্পর্কে জেনেও পার্টিকে রিপোর্ট করেনি।'

সুব্রতর শেষ মন্তব্যটার লক্ষ যে জয়া, তা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। সে জানে, পার্টিতে তার সম্পর্কেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তার কারণ, সে খুনোখুনি মারদাঙ্গার রাজনীতির সঙ্গে

নিজের বিবেকের সায় মেলাতে পারছে না।

এই ঘটনার ক'দিন বাদেই তপনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলেজ স্ট্রীটে। তাকে দেখেই সে এগিয়ে এল।

'জয়াদি, চা খাব।'

'এ আর বেশি কি? চল।'

জয়া বুঝতে পারল চা-টা শুধু উপলক্ষ। তপন কিছু বলতে চায়। তাই কম ভিড় দেখে একটা ছোট রেষ্টুরেন্টে এসে তারা বসল।

'জয়াদি, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞতা বলে আজকের অভিধানে কোন শব্দ নেই, তপন। ভবিষ্যতে এমনি আরো অনেক শব্দ অভিধান থেকে ছেঁটে ফেলব আমরা; নইলে কীসের সাংস্কৃতিক-বিপ্লব!' জয়া হেসে কথাগুলো বলল।

তপন বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন জয়াদি!'

সেদিন রাত্রে সুব্রত চলে যাওয়ার একটু বাদেই জয়া শম্পার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল তপন যেন সেই রাত্রেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। নইলে বিপদের আশঙ্কা। নিজের পার্টির কাছে এটা তার অপরাধ জেনেও জয়া তপনের জীবন বাঁচাতে এটুকু না করে পারেনি। হৃদয়ের নির্দেশ তাকে মেনে নিতে হয়েছিল।

তপন হাসতে-হাসতে বলল, 'ভালই হয়েছে। আর দ্বিধা নেই। আমি আমার পথ পেয়ে গেছি।'

'কী সেটা?'

'বিপ্লব। আমরা দেশে বিপ্লব আনব।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বিপ্লব যেন শম্পার মত একটি সুন্দরী মেয়ে—তুমি ইচ্ছেমত ডাকলেই সে চলে আসবে!'

জয়া জানে, তপনকে এ-সব বলা বৃথা। একটা অন্ধ আবেগ এখন তাকে চালিয়ে নেবে। বিচার বিশ্লেষণ অচল। ধৈর্যও নেই।

তপন হঠাৎ বলে ওঠে, 'জয়াদি, আপনি একদিন আমাদের

সবাইকে ইন্সপায়ার করতেন। শান্তনুদার বিরুদ্ধে কী দারুণ ফাইট না আপনি দিয়েছিলেন! কিন্তু আজ আপনার ভেতরকার সেই আগুন কোথায়? আজ আমরা সেই আগুন চাই। জ্বালিয়ে ফেলব সব।'

তপনের কথা শুনে জয়া হেসে উঠল। বলল, 'শুধু আগুন নিয়ে বিপ্লব হয় না তপন। এই সত্য একদিন তোমরা বুঝতে পারবে।'

তপনের পাড়া ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে পার্টিতে খুব গরম আলোচনা হয়েছিল। যদিও জয়ার নাম কেউ উল্লেখ করেনি, কিন্তু সুব্রতর সন্দেহ ছিল তার ওপর। অন্য এক সময় সে পার্থকে সে কথা বলেছিল।

একদিন পার্থ তাকে বলল, 'ব্যাপার কি জয়া? সুব্রত তোমাকে সন্দেহ করছে!'

'তার সন্দেহটা মিথ্যে নয়।' জবাব দিল জয়া, 'তোমাদের অ্যাকশন থেকে তপনকে বাঁচাবার জন্যই আমি এ কাজ করেছি।'

'আশ্চর্য! এ-তো বিশ্বাসঘাতকতা!'

'না।' দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল জয়া, 'নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলবার অধিকার তার আছে। তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকার দাসখত সে লিখে দেয়নি। যতদিন মতে মিলেছে, ছিল। এখন সে তার ইচ্ছেমত অন্য পথ বেছে নিয়েছে। এই জন্য তোমরা তাকে শাস্তি দেবে কেন?'

সেদিন অনেকক্ষণ বাক বিতণ্ডা হয়েছিল দু'জনে। পার্থ এক সময় তাকে বিদ্রূপ করে বলল, 'মনে হচ্ছে, তুমিও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ ওদের মত!'

সঙ্গে সঙ্গে জয়া জবাব দিল, 'না। তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে সেই মোহ আমার কেটে গেছে। এখন বিপ্লবের ব্যাপারটা

এত অসম্ভব মনে হয় যে তা নিয়ে আর স্বপ্ন দেখাও চলে না।'

জয়ার ভাবতে অবাক লাগে। তপন তাকে কেমন করে এত বিশ্বাস করতে পেরেছিল? সে তো সত্তর দশকের বিপ্লবী! তাদের কাছে তো ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন দাম নেই। জয়ার মতামত তার অজানা ছিল না। তবু পরম বিশ্বাসের সঙ্গে মনের কথা খুলে বলতে তার বাধে নি। তাকে কি এখনো তারা বাঁচিয়ে রেখেছে?

দরজার কড়া নড়ে উঠল। পার্থর গলার সাড়া পেয়ে রাজুর মা গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সে ঘরে ঢুকলে তার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে জয়া। খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে তাকে। অন্যদিন হলে জয়া উঠে গিয়ে কথা বলত তার সঙ্গে। আজ সে উঠল না। পার্থ নিঃশব্দে জামা-কাপড় ছেড়ে একটা পাজামা পরে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। জয়ার দিকে একবারও তাকায় নি সে।

খাবার টেবিলে দু'জনে মুখোমুখি দেখা হয়।

জয়া জিজ্ঞেস করল, তোমরা তপনকে কী করেছ?'

পার্থ জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে খেতে থাকে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি বৈকি! তোমার বোঝা উচিৎ এর জবাব তুমি আমার কাছে পেতে পার কিনা।'

জয়া গুম হয়ে বসে থাকে। সে জানে, প্রশ্ন করা বৃথা। পার্থ কিছুই বলবে না। জয়া তার সামনে থেকে থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল।

'এ-কি, খাবে না?' জয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে পার্থ।

'না।'

'এ তোমার অন্যায় রাগ।'

জয়া পার্থর কথার জবাব না দিয়ে সোজা শোয়ার ঘরে এসে ঢোকে। তারপর একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ে।

৬

রাজুর মার ডাকে জয়ার ঘুম ভাঙ্গে। ক'টা বাজল এখন?

'রাজুর মা, ক'টা বেজেছে?' ঘুম-চোখেই জিজ্ঞেস করে জয়া?

'অনেক বেলা হয়েছে। দাদাবাবু তো কখন বেরিয়ে গেছেন।'

'তাই নাকি?' চোখ মেলে তাকায় জয়া। সামনেই টেবিলের ওপর টাইম-পীসটা নজরে পড়ে। ন'টা বেজে গেছে। তাই তো! আজো কলেজে যাওয়া হল না।

রাজুর মা চা নিয়ে আসে। জয়ার মাথার কাছে চা-এর কাপটা রেখে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কিছু বলবে রাজুর মা?' জয়া জিজ্ঞেস করে।

'দিদিমণি!' রাজুর মা'র গলার স্বরে বিস্মিত হয়ে জয়া তার দিকে মুখ তুলে তাকায়।

'তোমার কী হয়েছে?' রাজুর মা বলে, 'ক'দিন ধরে দেখছি তোমার কিছুতে মন নেই। কলেজে যাচ্ছ না। চোখ-মুখের চেহারা কেমন হয়ে গেছে।'

'আমার মনটা ভাল নেই, রাজুর মা! টুকুনের বাপির অবস্থা খুব খারাপ।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল জয়া।

'হায় ভগবান!' শুনেই রাজুর মা আর্তনাদ করে ওঠে, 'কি হয়েছে দাদাবাবুর?'

জয়ার মুখ থেকে সব শুনে রাজুর মা কেঁদে ফেলে। শান্তনুর প্রতি বরাবরই তার খুব শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের টান ছিল। এখনো আছে।

সে বলে, 'এমন দেবতার মত মানুষটার গায়ে কে হাত তুলল গো? তারা কি মানুষ? তাদের প্রাণে কি দয়া-মায়া বলে কিছু নেই?'

জয়ার মনে আছে, শান্তনু এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর রাজুর মা খুব কান্নাকাটি করেছিল। জয়া একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখল, টুকুন তার বাপির জন্য কাঁদছে আর তার সঙ্গে কেঁদে চলেছে রাজুর মাও। জয়াকে দেখেই সে বলে উঠল, 'দিদিমণি, তুমি কি পাষাণ গো! দেখ মেয়েটার কি অবস্থা!' জয়া বলল, 'তোমার অবস্থাই বা কম কি?' রাজুর মা বলল, 'কি করব, সইতে পারি না। সবাই তো তোমার মত পাষাণ নয়।' শুনে খুব রাগ হয়েছিল জয়ার। তবু সে সেদিন তাকে কিছু বলেনি। অন্য কেউ এমন কথা বললে তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় করে দিত সে। রাজুর মা বলেই রেহাই পেয়ে গেল। অবিশ্যি আর কেউ বলতে সাহসও পেত না।

প্রথম সংসার শুরু করার দিনগুলির কথা মনে আছে জয়ার। কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের। শান্তনু বাজার করতে গিয়ে বুঝত না কোন জিনিস কী পরিমান কিনবে। তেমনি ছিল সে নিজে। রাঁধতে গিয়ে নুন দিতে ভুলে যেত কিম্বা পুড়িয়ে ফেলত। রান্নার ভয়ে কতদিন তাদের হোটেলে খেতে হয়েছে। তাদের অবস্থা দেখে মা বলেছিল, 'দু'টোই সমান অপদার্থ! বেশ জুটি মিলেছে।' তারপর মা-ই রাজুর মাকে পাঠিয়ে দিল। সে তাদের বাড়িতে অনেক বছর ছিল। তাকে পেয়ে জয়া যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেদিন থেকে সংসারের সমস্ত ভার তার ওপর। জয়াও সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত। এমন কি টুকুনের জন্যও তাকে তেমন কিছু করতে হয়নি। তাকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা— সব কিছুই করেছে রাজুর মা। শান্তনু বলত, 'রাজুর মা, তুমি না

থাকলে আমাদের কী দশা হত ?'

মজার ব্যাপার, পার্থর সঙ্গে রাজুর মা'র তেমন ভাব হয় নি। পার্থ এ বাড়িতে আসার পর বেশ কিছুদিন সে খুব গম্ভীর হয়ে ছিল। চুপচাপ নিজের মনে কাজ করে যেত। পার্থর ওপর সে-যে খুব প্রসন্ন ছিল না, সেটা বুঝতে জয়ার অসুবিধা হয় নি। হয়ত সে ভাবত তার জন্যই শান্তনুকে এই বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।

চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল,—এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে কাপটা সরিয়ে রেখে জয়া বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আলনা থেকে শাড়িটা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। অনেকক্ষণ পরে স্নান সেরে যখন সে বেরিয়ে আসে তখন নিজেকে খুব ফ্রেস মনে হয় তার। মাথাটাও হালকা লাগে। ওষুধের গুণে কিছু ঘুম হয়েছে কাল রাত্রে। এ-টুকুই যথেষ্ট তার পক্ষে। অন্যমনস্ক ভাবে বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে সে। না—এ তার চোখের ভুল! মনের ভুল! স্মৃতির বিভ্রম! হ্যাঁ, এমনি করেই একদিন সে স্নান সেরে এই আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার নজরে পড়েনি আরো এক-জোড়া চোখ পেছন থেকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকে দেখছে! হঠাৎ আয়নার মধ্যে চোখাচোখি হলে প্রথমটায় জয়া চমকে ওঠে, তারপর হেসে ফেলে।

'কী দেখছ ?'

'তোমাকে।'

'আমি খুব বিশ্রী দেখতে তাই না ?'

'তা বৈকি! সারা বিশ্ববিদ্যালয় ছেঁকে তুলে এনেছি—বিশ্রী বললেই হল ?'

শান্তনুর মুখে ফুটে ওঠে গর্বের হাসি। জয়ারও খুব ভাল লাগে। একটা কোমল আনন্দময় অনুভূতি। সে হাসতে হাসতে বলে, 'জালটা খুব ফেলেছিলে। কেমন সহজেই ধরা পড়ে গেলাম।'

শান্তনু নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ায়, তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়। কতক্ষণ কেটে যায় নিঃশব্দে। এক সময় সে বলে, 'ভারী অদ্ভুত—তাই না?'

'কী?' জয়ার দৃষ্টি শান্তনুর মুখে।

'একদিন আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। অথচ আজ আমরা একজন আর একজনকে ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতে পারি না।'

এর নামই কি ভালবাসা!

রক্তের মধ্যে কেমন নেশা ধরে যায়। তার মাথাটা আপনা থেকে ঝুঁকে পড়ে শান্তনুর বুকে; সে তার মুখটাকে তুলে ধরে চুমু খায়।

না, সব মিথ্যে। নিছক ভাবালুতা। নইলে শান্তনুকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে জয়া বেঁচে আছে কেমন করে? আর শান্তনু! ছাড়াছাড়ির মুহূর্তে একবারও কি তার মনে পড়েছিল নিজের কথাগুলো? বাঁচা যায় না! বেশ বাঁচা যায়। নইলে এ ক'বছর কেমন করে কাটাল?

'জয়াদি!'

দরজার সামনে শম্পাকে দেখে চমকে ওঠে জয়া।

'জয়াদি, আমি আপনার কাছে এসেছি।' বলতে বলতে ভেতরে ঢোকে শম্পা।

জয়া তার সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলে। শম্পাকে দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। সে জানে কী আশা নিয়ে সে তার কাছে এসেছে। কিন্তু তার কী করার আছে?

'জয়াদি, একবার আপনি তার জীবন রক্ষা করেছিলেন'—বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে শম্পা। জয়া দু'হাতে তাকে বুকে টেনে নেয়। কী সান্ত্বনা তাকে সে দিতে পারে?

'বিশ্বাস কর শম্পা, আমিও আজ তোমার মতই অসহায়।'

'ওকে ওরা কোথায় রেখেছে!'

'জানি না। জিজ্ঞেস করেও জানতে পারিনি। ওরা এখন আমাকেও বিশ্বাস করে না।'

'পার্থবাবু কোথায়?' শম্পার দু'চোখে আগুন, 'আমি তাঁকেই জিজ্ঞেস করব।'

'সে কি কিছু বলবে? বুঝতেই পারছ!'

'তা হ'লে আপনি আমাকে বলে দিন, জয়াদি—আমি কী করব?' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে শম্পা। জয়া একটা হাত তার পিঠে রেখে ডাকে—'শম্পা!' শম্পা মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'জয়াদি, আপনার কি মনে হয় তপন এখনো বেঁচে আছে?' তপন নেই ভাবতে গিয়ে সে সহ্য করতে পারে না। চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

একজনের জন্য আর একজনের প্রাণের এই আকুতির নামই কি ভালবাসা! জয়াও তো একদিন পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি, টিয়ার-গ্যাস অগ্রাহ্য করে স্তূপীকৃত মৃত ও আহতদের মধ্যে শান্তনুকে খুঁজতে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল প্রাণের একই আকুতি নিয়ে! সেদিন তো তপনই—যার জন্য শম্পা আজ ছুটে এসেছে তার কাছে—সেই তাকে জোর করে ধরে রেখেছিল। মৃত্যুর মুখে যেতে দেয় নি তাকে। আজ তার ঋণ কেমন করে শোধ করবে সে?

জয়া বলে, 'শম্পা, কেঁদো না। মনটাকে শক্ত কর। অভিশপ্ত এই সত্তর দশক কি দেবে জানি না—কিন্তু নেবে অনেক! এ কি শুধু তোমার একার দুঃখ? দেখছ না চারদিকের অবস্থা!'

এক সময় চোখ মুছে শম্পা উঠে দাঁড়াল। তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসি জয়াদি।' কেমন উদাস শোনায় তার কণ্ঠস্বর। জয়ার ভয় লাগে। এই বয়সটার ইমোশন বড় মারাত্মক।

কিছু একটা কাণ্ড করে বসবে না তো ?

মাত্র দিন কয়েক আগে শম্পার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'শম্পা! খবর কি তোমার ?' এক চিলতে করুন হাসি মুখে ফুটিয়ে সে বলল, 'ভাল না জয়াদি।'

'তপনের সঙ্গে দেখা হয় ?'

'খুব কম।'

'তাকে সাবধানে থাকতে বলো। বলবে জয়াদি বলেছে।'

'বল্‌লেই কি শুনবে ? সেদিন বেলেঘাটার ঘটনাটা কাগজে পড়েছেন তো! পুলিশ যাদের ঘিরে ফেলেছিল তপনও তাদের মধ্যে ছিল। চারজনকে ধরে পুলিশ রাস্তার ওপর গুলি করে মেরেছে—তপন একটুর জন্য ধরা পড়েনি। বলুন জয়াদি, এ-সব শুনলে ভাল লাগে ?'

'একটা পাগলকে তুমি ভালবেসেছ। এখন আর আফশোস করে কি হবে ?' বলেছিল জয়া।

বছর চারেক আগে তপন একদিন শম্পাকে এনে হাজির করেছিল মহিলা সমিতির অফিসে।

'জয়াদি, একটি নতুন রিক্রুট। দেখুন কাজে লাগাতে পারেন কিনা!' বলেছিল তপন।

মাঝে-মাঝে শম্পা আসত। কিছুদিন কাজও করেছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু জয়া বুঝতে পেরেছিল রাজনীতি সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ নেই। তপনকে খুশী করতেই তার আসা। তাদের ভালবাসার সূত্রপাত কবে কি ভাবে হয়েছিল জয়ার জানা নেই। কিন্তু শম্পা ভুল করেছিল। তপনকে সে চিনতে পারেনি। তার কাছে রাজনীতি কোন শখের ব্যাপার ছিল না। সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন সে দেখেনি শম্পার মত। তাই যদি হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর ভাল চাকরির অফার পেয়েও সে গ্রহন করেনি কেন ? শম্পা কি বুঝতে পারে নি তার মনোভাব ? হয়ত তার আশা ছিল, একদিন সে তাকে

ফিরিয়ে আনতে পারবে। বেচারী শম্পা!

ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না জয়ার। সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। একটু ঘুরে আসা যাক। রাস্তার মোড়ে কেষ্টর সঙ্গে দেখা।

'জয়াদি, কোথায় চললেন?' কেষ্ট এগিয়ে এসে বলল।

'এমনি একটু ঘুরতে বেরিয়েছি। তোমাদের কী খবর?'

'সব ঠিক আছে। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শম্ভুদার জীবনের বদলা নেব। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা রেখেছি।' গলার স্বর একটু নিচু করে কেষ্ট বলে। জয়া নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাসখানেক আগে কারখানার শ্রমিক শম্ভু পাল অন্য পাড়ার ভেতর দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পাইপগানের গুলিতে মারা গিয়েছিল। তার স্ত্রী ও একটি ছেলে এখন নিঃসহায়। পার্টির ছেলেরা কিছু কিছু সাহায্য করে। কিন্তু এ-ভাবে তারা কতদিন সাহায্য করবে? কত জনকে করবে?

'কাল ওকে ধরতে কম ঝামেলা গেছে?' কেষ্ট বলে।

জয়া বুঝতে পারে কার কথা সে বলছে। তার কান সজাগ হয়ে ওঠে। চোখে উৎসুক দৃষ্টি। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তপনের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। আমরা খবর পেয়েছিলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ও প্রায়ই আসে। আমরাও ওত পেতে ছিলাম। ঠিক মৌকা মিলে গেল। হঠাৎ পাকড়াও করে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে সোজা নিয়ে এলাম।'

জয়া আর শুনতে পারছিল না। তবুও তার কানে গেল কেষ্ট বলছে, 'জানেন, ওর সঙ্গে রিভলবার ছিল! সেটা বের করতে পারলে আমাদের মুশকিল হতো, কিন্তু সে-সুযোগই আমরা ওকে দিইনি। ধরে এনে রাত্রেই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

জোর করে গলা থেকে স্বর বের করল জয়া, 'এখন আসি।' চলতে গিয়ে তার মাথা ঘুরছে, শরীর টলছে। গাছপালা বাড়ি ঘর

সবই যেন ঘুরতে থাকে তার চোখের ওপর। পাশ দিয়ে একটা খালি রিক্সা যাচ্ছিল, জয়া তাতেই উঠে বসল।

পার্থ ঠিকই বলে। জয়ার নার্ভ বড় দুর্বল। এমনি দুর্বল নার্ভ নিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায় না। কিন্তু ঘাতক আর বিপ্লবী কি এক? এই প্রশ্নটাই একদিন সে পার্থকে করেছিল। পার্থ জবাব দিয়েছিল, 'এ-সব হচ্ছে অর্থহীন একাডেমিক প্রশ্ন। শত্রুর প্রতি ঘৃণাই একজন বিপ্লবীর স্বাভাবিক আচরণ। তাকে ধ্বংস করতে দয়া মায়ার প্রশ্নই আসতে পারে না।'

জয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের শত্রুতা কি ব্যক্তির সঙ্গে না সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে? ধ্বংস যদি করতেই হয়, তার লক্ষ হওয়া উচিৎ সমাজ-ব্যবস্থা। কিন্তু সেই লক্ষ থেকে আজ আমরা কত দূরে সরে যাচ্ছি, সেটা ভেবে দেখেছ?' একটু দম নিয়ে জয়া আবার বলল, 'এক সময় তো আমাদের আত্মসমালোচনার রেওয়াজ ছিল। আজকাল দেখছি তোমরা তার প্রয়োজন বোধ কর না। তা হলে অনেক ভ্রান্তি ধরা পড়ত।'

পার্থ খুব রেগে গিয়েছিল। সে তাকে আঘাত করল অন্য দিক থেকে। বলল, 'মনে হচ্ছে, শান্তনুর মুখ থেকে কথাগুলো ধার করে নিয়ে এসেছ!'

জয়াও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। আজকাল এ যেন পার্থর রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন ব্যাপারে জয়া ভিন্নমত প্রকাশ করলেই সে তার মধ্যে শান্তনুর প্রভাব দেখতে পায়! জয়া জবাব দিল, 'কথাটা কার মুখের, তারচেয়ে বড় কথা, কথাটা সত্যি কিনা।' আর কিছু না বলে সে উঠে গিয়েছিল।

রিক্সাটা এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল জয়া। না, তপনের কথা ভেবে লাভ নেই। সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

৭

জয়া ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়। এই কি শান্তনু! নাকে অক্সিজেনের সরু নল। হাত-পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। বাঁ-হাতের সঙ্গে যুক্ত স্যালাইনের নল। দু'চোখ বোজা। মৃতের মত স্পন্দনহীন তার দেহ। মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছে রথীন। একজন নার্স ঝুঁকে পড়ে তার দেহে ইনজেকশন দিচ্ছে। জয়ার মাথার মধ্যে কেমন করে ওঠে। সেদিনের মত সব কিছু যেন ঘুরপাক খেতে থাকে চোখের সামনে। হাত বাড়িয়ে দরজাটা ধরে জয়া।

'জয়া!' রথীনের স্বরে উদ্বেগ। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে। কয়েক মুহূর্ত। নিজেকে সামলে নেয় সে।

'ভয় নেই রথীন—আমি ঠিক আছি।' ধীরে ধীরে জয়া বলল।

'এখানটায় তুমি বস।' একটা টুল এগিয়ে দিয়ে রথীন বলে।

'আজ ও কেমন আছে?'

'আগের চেয়ে ভাল।'

'তুমি আজ সারাদিন এখানে আছ?'

'হ্যাঁ। রাত্রে অন্য লোক থাকবে।'

'কাল দিনের বেলা আমি থাকব।'

'বেশ তো। থেকো।'

নার্স ইনজেকশন দিয়ে চলে যায়। জয়া টুলটাকে শান্তনুর বেডের কাছে টেনে নিয়ে বসে।

রথীন বলে, 'আমি একটা ইনজেকশন কিনতে বাইরে যাচ্ছি।' সে বেরিয়ে যায়। জয়া একটা হাত শান্তনুর কপালে রাখে। কত পরিচিত

স্পর্শ! একদিন এই মানুষটাকেই না সে ভালবেসেছিল! রাজনীতির সংঘাতে দু'জনের সম্পর্ক বিষিয়ে না উঠলে আজো হয়ত সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকত। রাজনীতিই তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছিল। একদিন মূলতঃ শান্তনুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণই তাকে রাজনীতির জগতে টেনে এনেছিল। কিন্তু সেদিন কি সে ভাবতে পেরেছিল যে সেই রাজনীতি একদিন তার সত্তাকে গ্রাস করে ফেলবে? শান্তনুও ভাবতে পারেনি। সে চেয়েছিল তাকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে, নিজের সহকর্মীরূপে পেতে। কিন্তু জয়ার পক্ষে তা হওয়া সম্ভব হল না। সে হয়ে উঠল এক ভিন্ন ব্যক্তিত্ব।

শান্তনু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর তার স্থান দখল করল জয়া। সে তখন বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে। রোজ সভা, মিছিল, বিধানসভা অভিযান। একদিন মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়াল পুলিশ। তারপর লাঠিচার্জ আর টিয়ারগ্যাস। আরো কয়েকজনের সঙ্গে জয়াকেও যেতে হল জেল-হাজতে। জেলের অভিজ্ঞতা তার জীবনে সেই প্রথম। কিন্তু জেলের মধ্যেও সে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। ভাল খাবার আর ব্যবহারের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছে অন্যান্য বন্দীনীদের সঙ্গে নিয়ে। সেখানেই কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল।

একজন ছিল শান্তি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার পর ছোট তিনটি ভাই-বোন, তার মা আর সে—এই পাঁচজনের সংসারে নেমে এল অন্ধকার। কঠিন জীবন-সংগ্রাম। উপোস, অভাব আর নানা অপমানকর অভিজ্ঞতার শেষে শান্তিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল 'খালি-কুঠি'-র দেহোপজীবিনীর পেশা। তারপর সেখানে একদিন পুলিশের হানা, যার ফলে চলছে ছ'মাস ধরে তার হাজতবাস। শান্তি বলেছিল, 'দিদি, বিশ্বাস করুন—আমার সামনে এতগুলো লোকের একটা সংসারকে রক্ষা করার আর কোন পথ খোলা ছিল না।'

আরো কত মেয়ে। মদ চোলাই, চাল পাচার, পকেট কাটা, প্রতারণা, গৃহত্যাগ, স্বামী-হত্যা ইত্যাদি কত রকম অপরাধের সঙ্গে তারা জড়িত। তার মধ্যে অদ্ভুত বলিষ্ঠ চরিত্র ছিল বৃন্দার। স্বামীর সঙ্গে সেও কাজ করত চটকলে। ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে রোজ রাত্রে স্বামীর মদ খেয়ে হল্লা করা এক রকম সহ্য হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু যেদিন তার নজরে পড়ল সে রামসুরতের বউকে নিয়ে আসনাই করছে, সেদিন আর সহ্য করতে পারেনি বৃন্দা। মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল। দু'জনের ঝগড়া গিয়ে দাঁড়াল হাতাহাতিতে। বৃন্দা যখন দেখল স্বামীর হাতের একটা মোটা গড়ানের লাঠি তার মাথার উপর উদ্যত তখন সে মুহূর্ত না ভেবে চোখ বুজে হাতের হাঁসুয়াটা ছুড়ে মারল তার দিকে। তৎক্ষণাৎ একটা আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল বৃন্দার স্বামীর রক্তাক্ত দেহ। তারপর দু'বছর ধরে বৃন্দা রয়েছে জেল-হাজতে। হাকিমের কাছে সব কথা স্বীকার করে সে বলেছে—'আমাকে ফাঁসি দিন হুজুর। আমি ওর কাছে যেতে চাই।'

সমাজের জমাটবাঁধা অন্ধকারের তলায় চাপা-পড়া নানা জাতের মেয়ের সঙ্গে মিশে জয়া সেদিন নতুন ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, সমাজ-বিপ্লব ছাড়া নারীর মুক্তি নেই। সেই বিপ্লবের আবাহনই তার জীবনের ব্রত।

শান্তনু একদিন জেল-গেটে এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। জয়া লক্ষ করেছে —তার চোখে ছিল বিস্ময়। সে যেন এক নতুন জয়াকে আবিষ্কার করেছে। নতুন ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত ইস্পাতের মত শাণিত এই জয়া।

শান্তনু কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তোমার বেইল-এর জন্য মুভ করা হয়েছে। বোধহয় হয়ে যাবে।'

জয়া হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'তার জন্য আমার ভাবনা নেই। আমি বেশ আছি।'

শান্তনু তার কথা শুনে অবাক হয়েছিল বৈকি ! বোধহয় ভেবেছিল, এই কি ফিফ্‌থ ইয়ারের সেই লাজুক মেয়ে, যাকে সে একরকম জোর ক'রে আন্দোলনের মধ্যে নামিয়েছিল !

আর একটা দিনের কথা জয়া ভুলতে পারে না।

উনষাট সালের সেই খাদ্য আন্দোলন। রাজভবনের সামনে বিশাল সমাবেশ—আইন অমান্য করতে ডালহৌসির দিকে যাবে। বিরাট পুলিশবাহিনী ঘিরে রেখেছে তাদের। শান্তনুর একটা হাত মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে ধরে রেখেছে জয়া।

শান্তনু কানে কানে বলল, 'লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না।'

'কি করবে ওরা ?' বলল জয়া, 'আমরা এত লোক ! দেখো, কিছু করতে সাহসই পাবে না।'

'আয়োজন দেখে আমার অন্যরকম মনে হচ্ছে। জয়া, তুমি কার্জন পার্ক-এর দিকে চলে যাও। নইলে হঠাৎ গোলমাল শুরু হলে ভিড়ের চাপে পিষে যাবে।'

'তুমি !'

'আমাকে তো থাকতেই হবে।'

'আমিও থাকব। তোমাকে ফেলে আমি যাব ভেবেছ !'

শান্তনু ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দেখতে-দেখতে শুরু হয়ে গেল লাঠিচার্জ। কি যে ঘটছে কেউ জানে না। জনতা রোলারের মত কার্জন পার্কের দিকে গড়িয়ে চলেছে। প্রলয় কাণ্ড। নিজের মুঠো থেকে কখন শান্তনুর হাত ছিটকে গেছে টের পায়নি জয়া। বিশাল জনতার চাপে কখন কি ভাবে সে ধর্মতলার মোড়ে এসে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তার খেয়াল ছিল না। কে যেন তার কানের কাছে চিৎকার ক'রে বলে উঠল, 'এভাবে পড়ে থাকবেন না। শক্তি সঞ্চয় ক'রে উঠে পড়ুন।' হঠাৎ জয়ার স্নায়ুতন্ত্রীতে ঝাঁকুনি লাগল। তার চেতনার মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা ফিরে এল। মনে পড়ল শান্তনুর কথা।

সে এখন কোথায় ? দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে উঠে দাঁড়াল জয়া। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ভয়ঙ্কর কিছু যে ঘটে গেছে, বুঝতে দেরি হল না ! তার মাথার মধ্যে তখন ঝড় বইতে শুরু করেছে। শান্তনুকে খুঁজে বের করতে হবে। সেও হয়ত তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জয়া পাগলের মত ছুটে চল্‌ল কার্জন পার্কের দিকে—চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগল—'শান্তনু ! শান্তনু !' অনেকে বাধা দিল—'ও-দিকে যাবেন না। গুলি চলছে।' কারো নিষেধ মনে তুলবার মত অবস্থা ছিল না তার। সে কার্জন পার্কের উত্তর প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াল। শত শত লোক ইটের টুকরো সংগ্রহ ক'রে ছুঁড়ে মারছে পুলিশবাহিনীকে লক্ষ ক'রে। রাস্তার ওপর নজর পড়তেই জয়া শিউরে উঠল। এত লোক পড়ে রয়েছে ! তারা সবাই কি মৃত ? শান্তনুও কি তাদের মধ্যে আছে ? আর ভাবতে পারল না সে। আবার ছুটতে শুরু করল। কিন্তু কে যেন তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। জোর ক'রে ধরে রাখল।

'ছাড়ুন।' চিৎকার ক'রে উঠল জয়া।

'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে ? ও-দিকে গেলে ফিরতে পারবেন ?' মুখের দিকে তাকিয়েই জয়াকে চিনতে পারল তপন। সে অবাক হয়ে বলল, 'এ-কি, জয়াদি !'

'তপন, শান্তনুকে খুঁজে পাচ্ছি না।' হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল জয়া।

তারপর দু'জনে মিলে চারদিকে তাকে খুঁজেছে। মেডিকেল কলেজ আর পি-জি হাসপাতালও বাদ যায়নি। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। বাড়িতেও ফেরেনি সে। জয়ার অবস্থা দেখে তপন বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। পরদিন হরতাল, তা সত্বেও সে খবর সংগ্রহ করে আনল।

'জয়াদি, আপনি অযথা কান্নাকাটি করছেন! শান্তনুদা তো সরকারের অতিথিশালায় দিব্যি আরামে রয়েছেন।' হাসতে-হাসতে বলেছিল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে জয়া শান্তনুর দিকে তাকায়। চেতনা আছে কিনা বুঝবার উপায় নেই। অক্সিজেনের সরু নলটা নিঃশ্বাসের চাপে একটু একটু কাঁপছে। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! সেদিন যাদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছিল, হয়ত তাদের মধ্যেই কেউ আজ আততায়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্রের আঘাতে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করেছে!

কিন্তু জয়ার নিজের ভূমিকা! সে-ও কি ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতাকে শ্রেণীযুদ্ধের অস্ত্র বলে মেনে নিয়ে শান্তনুকে কম আঘাত করেছে? চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই আদর্শের দ্বন্দ্বে চৌষট্টি সালে পার্টি ভাগ হবার পর শান্তনু রয়ে গেল পুরনো পার্টিতে। জয়া যোগ দিল নতুন পার্টিতে। শান্তনু বোধহয় ভাবতে পারেনি। কিন্তু আদর্শ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কম্প্রমাইজ করা জয়ার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তার ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব বিচারবুদ্ধি তাকে বাধা দিয়েছে।

'তুমি ভুল করছ জয়া। ভাল ক'রে ভেবে দেখ।'

'ভেবেছি। তোমরা বিপ্লবের পথ থেকে সরে গেছ। তোমরা বিপ্লবের শত্রু।'

'এ-তো কুৎসা।'

'কুৎসা হবে কেন? বুর্জোয়াদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বরং তোমরাই কুৎসা গাইছ বিপ্লবী চীনের বিরুদ্ধে।'

'চীন যদি ভুল করে তবু তা মেনে নিতে হবে?'

'চীন ভুল করেনি। করলেও আমরা বুর্জোয়াদের সুরে সুর মেলাব না।'

তারা বুঝতে পেরেছিল তর্ক করা বৃথা। কেউ নিজের অবস্থান

ত্যাগ করবে না। দু'জনই মনের চাপা আক্রোশে ফুঁসতে লাগল। তারপর ছোটখাট ঘটনা থেকে শুরু হল ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়া-বিবাদ। কেমন করে যেন তাদের পরস্পরকে সহ্য করার শক্তি একেবারে ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু জয়া ভাবতে পারেনি তার নিজের বিশ্বাসে একদিন চির ধরবে। এশিয়ার বুকে বিপ্লবী উদীয়মান চীন! তাকে ঘিরে কত স্বপ্ন ছিল তাদের। শোধনবাদী রাশিয়া আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পথ ত্যাগ করলেও চীন রয়েছে। তার কাছ থেকে পৃথিবীর নানা দেশের বিপ্লবীরা পাবে অনুপ্রেরণা। সেই স্বপ্ন আজ কোথায়? চীনের নাকের ডগায় ইন্দোনেশিয়ার বুকে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী নিহত হল, আর সে রয়ে গেল নির্লিপ্ত দর্শক! এই তার বিশ্ব-বিপ্লবী চরিত্র! সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা আর পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে গড়ে উঠছে তার মিত্রতা। তার কাছে আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই হল প্রধান শত্রু! হোক তারা শোধনবাদী, তবু তারা কি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চেয়ে খারাপ?

না, জয়ার কাছে চীন আজ দুর্জ্ঞেয়। দুর্জ্ঞেয় তার নিজের পার্টির নীতিও। সে পারেনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে। বিশ্বাসের প্রশ্নে জয়া কখনো কম্প্রমাইজ করতে পারবে না। তবু তার দুঃখ লাগে। দুঃখ লাগে এদেশে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে। জয়া বিশ্বাস করে, বিপ্লব ছাড়া তাদের দুঃখের অবসান হবার নয়। কিন্তু বিপ্লবীদের আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব তাকে অসম্ভব করে তুলেছে। আর এই দ্বন্দ্বের মূলেও রয়েছে চীন!

সেদিন দেখা হয়েছিল শুভেন্দুর সঙ্গে। এক সময়ের নামকরা যুবনেতা। পার্টি ছেড়ে এখন সে একটা বড় ফার্মে ভাল চাকরি করে। অথচ এক সময় সে ভাবত বিপ্লবের জন্য সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

পেছন থেকে নিজের নাম ধরে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল জয়া।

'শুভেন্দু যে!' জয়া বলল।

'কেমন আছ?' শুভেন্দু তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে মলিও রয়েছে। মলি বলল, 'আমি দূর থেকে তোমার হাঁটা দেখেই চিনতে পেরেছি। ওকে বললাম ডাকতে।'

শুভেন্দু বলল, 'অনেকদিন পর দেখা। চল, কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।' তারা হাঁটতে হাঁটতে একটা রেষ্টুরেণ্টের কেবিনে এসে বসল।

জয়া বলল, 'মলি, তোমার শরীরে এত ফ্যাট জমছে কেন?'

শুভেন্দু হাসতে হাসতে মন্তব্য করল, 'হবে না? দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমুলে ফ্যাট ছাড়া আর কী জমবে?'

'হ্যাঁ, তাই। খুব সুখী-সুখী চেহারা হয়েছে। তুমিও কম যাওনা শুভেন্দু।'

জয়ার প্রচ্ছন্ন খোঁচা নিশ্চয়ই ওরা ধরতে পেরেছে। তবুও গায়ে মাখল না। শুভেন্দু হেসে জবাব দিল, 'ঠিকই বলেছ।'

রাজনীতি করার এই একটা বদভ্যাস। রাজনীতি ছেড়ে দিলেও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ছেড়ে দেওয়া যায় না। শুভেন্দুরও তাই হয়েছে।

সে খোঁচা দিয়ে বলল, 'নেতাদের খামখেয়ালীর খেসারত আর কত দিন তোমরা দেবে, জয়া?'

'সেটা যাদের ব্যাপার, তাদের ভাবার জন্যই ছেড়ে দাও না কেন?' বলল জয়া, 'তোমার আর দুশ্চিন্তা কী—তোমাকে তো খেসারত দিতে হবে না!'

জয়া ইচ্ছা করেই শুভেন্দুকে আঘাত দিতে কথাগুলো বলেছিল। কিন্তু সে নির্বিকার। একটু হেসে সে বলল 'আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দলত্যাগের ব্যাপারটা তুমি বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছ। তার দরকার নেই। আমার মনে আছে। এ-ও

মনে আছে, আমার কাছে দলের চেয়েও বড় ছিল মার্কসবাদের আদর্শ। সেই আদর্শের প্রশ্নেই আমি দল ছেড়েছি।' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বরে আবেগ সঞ্চারিত হল। সে জয়াকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবার বলল, 'আমি জানি, তোমরা বলাবলি করেছ, আমি ভয় পেয়ে গিয়ে দল ছেড়েছি। মলিকে বিয়ে করে সুখে-আরামে জীবন কাটাব বলে দল ছেড়েছি। আদর্শের প্রশ্নটা একটা অজুহাত।'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ, এ-ধরনের কথা হয়েছে তোমাদের নিয়ে।'

'কিন্তু তার একটাও ঠিক নয়,' দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল শুভেন্দু, 'অন্যদের কথা বাদ দাও। কিন্তু তুমি তো আমাকে অনেক বছর ধরে জান, জয়া। তুমি কী বিশ্বাস করেছিলে আমি নিজের সুখের কথা ভেবে দল ছেড়েছি?'

'এ নিয়ে আর এখন আলোচনা করে লাভ কি শুভেন্দু? বাদ দাও এ-সব। অন্য কথা বল।'

'তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ?'

'না। আমি শুধু বলছি, তুমি যখন পার্টি ছেড়ে দিয়েছ—'

'হ্যাঁ, ছেড়েছি, কিন্তু কেন? আমি বুঝতে পেরেছি, নেতৃত্বের মধ্যে একটা কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে। তাদের কোন আদর্শ নেই, মার্কসবাদ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তারা বুর্জোয়া পার্টিগুলোর মতই সুবিধাবাদী রাজনীতি করছে। হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ের জীবন নিয়ে অ্যাডভেনচার করছে।'

মলি বাধা দিল শুভেন্দুকে। বলল, 'এ-কি, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?' তারপর জয়াকে বলল, 'আজকাল প্রেসারে ভুগছে। উত্তেজিত হওয়া ডাক্তারের বারণ, তবু কথা শুনবে না। রোজ সকালের কাগজ পড়তে গিয়ে একা-একা চেঁচামেচি করবে। বল, এর কোন মানে হয়?'

জয়ার মনে হয়, নিজের বিবেকের সঙ্গে শুভেন্দুর লড়াই এখনো শেষ হয় নি। মলির কথায় তার উত্তেজনা প্রশমিত হল। সে শান্তভাবে বলল, 'এ কথা ঠিক, আমি আজ আত্মকেন্দ্রীকের মত জীবন যাপন করছি। কিন্তু এ-ছাড়া আমি আর কী করতে পারি এখন? বরং এটুকু আমার সান্ত্বনা, বিপ্লবের নামে আমাকে আত্ম-প্রতারণা করতে হচ্ছে না।'

শুভেন্দুর মত আরো অনেক কমরেডকে জয়া জানে, যারা এক সময় ভাল কর্মী ছিল, কিন্তু এখন তারা সরে গেছে বা যেতে বাধ্য হয়েছে। চারদিকে কেমন যেন একটা হতাশা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাই। অথচ কয়েক বছর আগেও অবস্থা অন্য রকম ছিল। পার্থ এ-সব গ্রাহ্য করে না। সে বলে, 'শ্রেণী সংগ্রাম যত তীব্র হবে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদী চরিত্র তত এক্স-পোজড হতে থাকবে। এটাই নিয়ম।' কিন্তু জয়া দেখতে পায় না কোথায় শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে সংগ্রামের ঢেউ আজ স্তব্ধ। শুধু মধ্যবিত্ত ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরছে। এ-কি শ্রেণী-সংগ্রাম? না, শুভেন্দুর মত জয়াও পারবে না একে শ্রেণী-সংগ্রাম বলে মেনে নিতে।

হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দে চমকে ওঠে জয়া। তাড়াতাড়ি শান্তনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে—'শান্তনু!' দু'তিন বার ডাকে। কোন সাড়া নেই। আবার সেই শব্দ। জয়ার মনে হল তার জ্ঞান ফিরে এসেছে—সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু পারছে না বলতে। জয়া ছুটে গিয়ে নার্সকে ডেকে আনে; সে তাকে পরীক্ষা করে একটা ইনজেকশন দেয়। জয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখে।

নার্স যাবার সময় বলে, 'ভয় নেই।'

'সিস্টার, ওর কি জ্ঞান আছে?'

'আছে। কিন্তু এখন ওর ব্রেনের রেস্ট দরকার। তাই ঘুমের

ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে।'

নার্স চলে গেলে জয়া শান্তনুর কাছে এসে দাঁড়ায়। একটা হাত তার কপালে রাখে। আশ্চর্য! আজ এই লোকটি তার কেউ নয়। একজন অনাত্মীয়া ভিজিটর হিসেবে সে তাকে দেখতে এসেছে। সত্যিই কি শান্তনু তার কেউ নয়? নিজেকেই প্রশ্ন করে জয়া। তাই যদি হবে, তবে তার কষ্ট দেখে জয়ার বুকের মধ্যে এমন যন্ত্রণা হয় কেন? কেন ইচ্ছে করে নিজের সর্বস্ব দিয়েও তাকে সারিয়ে তুলতে?

হঠাৎ জয়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শম্পার কান্নাভাঙা মুখ। ভালবাসা! শব্দটার মধ্যে যেন রয়েছে কেমন এক আশ্চর্য যাদু! কেন মেয়েটা ভালবাসতে গেল অমন একটা দুরন্ত ছেলেকে? জয়ার ভীষণ কান্না পায়। কিন্তু সে জানে না কীসের জন্য এই কান্না! শম্পার জন্য, না কি নিজের বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখে! টুলটার ওপর বসে দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে কান্নার একটা অদম্য উচ্ছ্বাস দমন করতে চেষ্টা করে জয়া। তবুও তার দু'চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর প্লাবন!

৮

জয়া বাইরে থেকে এসে শাড়ি ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখে পার্থ শুয়ে পড়েছে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুমিয়ে পড়েছ?' জবাব নেই। কিন্তু সে-যে ঘুমোয়নি বুঝতে পারে জয়া। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে যে আজ?'

পার্থ তেমনি নিরুত্তর।

'আমার ওপর রাগ করেছ?' জয়া বিছানার এক পাশে গিয়ে বসে।

'বিরক্ত করো না, জয়া। ঘুম পাচ্ছে—আমাকে ঘুমুতে দাও।' পার্থ তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

জয়া বুঝতে পারে তার ধারনাই ঠিক। সে মিনিট খানেক নিঃশব্দে বসে থাকে, তারপর বলে, 'বেশ ঘুমোও। কিন্তু মনে করো না যে তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারিনি।' জয়া উঠে এলো।

রাজুর মা টেবিলে খাবার দিয়ে অপেক্ষা করছিল। জয়া এসে খেতে বসে। কেউ যদি তাকে ভুল বোঝে, তার কী করার থাকতে পারে?

রাজুর মা বলে, 'তুমি কি হাসপাতালে গিয়েছিলে দিদিমণি?'

'হ্যাঁ। সারাদিন তো ওখানেই ছিলাম।'

'দাদাবাবু আজ কেমন আছেন?'

'একটু ভালর দিকে।'

জয়া খেতে পারল না। ইচ্ছে করছে না খেতে। অথচ

খিদে আছে। রাজুর মা বলল, 'এ-কি, উঠে পড়লে! কিছুই খেলে না যে গো দিদিমণি।'

'না, ইচ্ছে করছে না খেতে।'

'কেমন করে করবে—'

জয়া চমকে রাজুর মার মুখের দিকে তাকায়। রাজুর মাও কি তাহলে সব বুঝতে পারছে! পারবেই বা না কেন? এত বছর একটা বাড়িতে থাকলে সেই বাড়ির মানুষদের নাড়ী-নক্ষত্র চেনা হয়ে যায়।

জয়ারও আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে শুতে গেল না। পার্থ নিশ্চয় এখনও ঘুমোয় নি। সে যতক্ষণ জেগে থাকবে, জয়া যাবে না শুতে। পাশের ঘরে এসে সোফায় গা এলিয়ে দিল সে। বড় অবসন্ন লাগছে শরীরটা। শুধু শরীর নয়, মনের মধ্যেও ভীষণ অবসাদ বোধ করে সে।

এই মুহূর্তে জয়ার নিজেকে খুব অসুখী মনে হচ্ছে কেন? একি তবে আর একটা নতুন ভাঙ্গনের শুরু? ভাবতেও খারাপ লাগে। না, এ-সব ভাবনা মনে স্থান দেবে না সে। পার্থ তাকে ভুল বুঝেছে। সেটাই স্বাভাবিক। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বা হবে কেন? জয়ার ওপর কি সে বিশ্বাস রাখতে পারছে না?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড় ডেলিকেট। কেমন করে যে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হবে, আগে থেকে অনুমান করা যায় না। জয়া তো এতদিন নিজেকে সুখী ভেবে এসেছে। আগের কথা ভেবে একদিনও তার মনে অনুশোচনা জাগেনি। পার্থর মত একজন বলিষ্ঠচরিত্র আদর্শবাদী পুরুষকে জীবনে পেয়ে সে ভুলে গিয়েছিল তার অতীত জীবনের কথা। কিন্তু আজকাল সেই অতীত জীবনটাই বারবার তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন? শান্তনুর ঘটনাটা তাকে খুব বিচলিত

করেছে সন্দেহ নেই। তার জন্য সহানুভূতি অনুভব না করে সে পারেনি। কিন্তু সেটাকে এর বেশি গুরুত্ব দিতে সে চায়নি। অন্তত পার্থর সঙ্গে এই নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেবে একবারও মনে হয়নি তার। হলেও সে কি নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারত?

শান্তনুর সঙ্গেও একদিন এমনি করেই না ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়েছিল। তাদের পুরনো পার্টি তখনো ভাগ হয়নি। ভাগ হবার পথে। দারুণ সংশয় ও অনিশ্চয়তা। তখন শান্তনু খুব চেষ্টা করেছিল তাকে স্বপক্ষে রাখতে। অনেক আলোচনা যুক্তি তর্ক—সব ব্যর্থ হল। শান্তনুদের বিরুদ্ধে তখন পার্থর নেতৃত্বে অধিকাংশ কর্মী দলবদ্ধ। জয়াও ছিল তাদের মধ্যে। পার্থ অবিশ্যি শান্তনুর মত অত সুন্দর করে তত্ত্ব বুঝাতে পারত না, কিন্তু সহজ করে সে যা বলেছিল, তাই সেদিন সত্য বলে মনে হয়েছিল তার। পার্থ বলেছিল. 'বিপ্লবের তত্ত্বে আপোষ বলে কোন শব্দ নেই। আছে শুধু সংগ্রাম। ওরা চায় আপোষ। তাই প্রয়োজন বিপ্লবীদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা।' রাজনীতি তখন জয়ার কাছে নেশার মত। তার সামনে ছিল সংগ্রামের ছবি, বিপ্লবের ছবি। তাই সেদিন শান্তনুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে দ্বিধাবোধ করেনি। তার এই দুঃসাহসিক কাজে সমস্ত কমরেডরা তাকে বাহবা দিয়েছিল। পার্থ বলেছিল, 'একজন বিপ্লবীর কাছে সবার আগে বিপ্লবের চিন্তা। পরে অন্য কিছু।'

শান্তনু একদিন হতাশ হয়ে বলেছিল. 'বেশ, তোমার পথে তুমি চল। আমি জানি, একদিন ইতিহাস তোমাদের ভুল ধরিয়ে দেবে।' তখনো বিচ্ছেদের প্রশ্ন তাদের মনে দেখা দেয়নি। চলেও যাচ্ছিল এক রকম করে। কিন্তু অবস্থা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল যুক্ত-ফ্রণ্টের আমলে। নানা জায়গায় তখন দুই দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটছে। এই নিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক দারুণ তিক্ত হয়ে উঠল। শান্তনু একদিন জয়াকে বলেছিল, 'লুম্পেনদের নিয়ে তোমরা বিপ্লবের

স্বপ্ন দেখছ?' জয়াও তাকে তীব্র কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, 'অন্তত বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মেলানোর চেয়ে সেটাকে খারাপ মনে করি না আমি।'

আর একবার রাজুর মা কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। জয়া টুকুনকে রেখে এসেছিল মা-এর কাছে। টুকুন তখন খুব ছোট্ট।

জয়া শান্তনুকে বলল, 'ক'দিনের জন্য কি আর একটা কাজের লোক পাওয়া যাবে? কী করা?'

শান্তনু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'কেন, তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না?'

তার কথা শুনে জয়ার মাথায় রক্ত চেপে গেল। সে চড়া মেজাজে জবাব দিল, 'আমার কাজ ফেলে তোমার জন্য আমি বসে বসে রাঁধব?'

'শুধু আমার জন্য কেন? তুমি খাবে না?'

'না—আমি হোটেল থেকে খেয়ে নেব।'

'বেশ তো। তা হলে আমিও তাই করব।'

সেদিন রাত্রে দু'জনই বাইরে খেয়েছিল। পরদিন সকালে জয়া চা করে এনে তার সামনে রাখল। কাপটা পড়েই রইল। সে খায়নি।

'চা খাচ্ছনা যে?'

'আমি দোকানে গিয়ে খাব।'

'তার মানে?'

'মানেটা কি বলে দিতে হবে? তুমি জান না!' বলতে বলতে গায়ে জামা চড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল শান্তনু।

এমনি ছোট খাটো ঘটনা নিয়ে দিনের পর দিন সংঘর্ষ। তখন দু'জনের মধ্যেই চেপে গেছে দারুণ জেদ। কেউ আঘাত

করার সুযোগ পেলে ছাড়বে না। একজনকে বিদ্ধ করেই তার একজনের আনন্দ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার দৈহিক সম্পর্কটুকুও আর রইল না। জয়ার মনে আছে এক-একদিন সে কেমন করে নিজের ইচ্ছাকে দমন করে রেখেছে। তখন মনে হতো, এ-ভাবে সে যেন শান্তনুকেই শাস্তি দিচ্ছে। তার মধ্যেই ছিল একরকমের আনন্দ। সত্যি, জয়ার আজ ভাবতে অবাক লাগে। শান্তনুর ওপর এত বিদ্বেষ কেমন করে তার মনে দানা বেঁধেছিল? এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। কিন্তু তখন তো একবারও মনে হয়নি তা? জয়া বোধহয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

তারপর ঘটল সেই ঘটনাটা। অবিশ্যি সেই ব্যাপারে জয়া নিজে দায়ী নয়। সে ছিল না ঘটনাস্থলে। থাকলেই বা সে কি করতে পারত? বরং না থেকে ভালই হয়েছিল। আজ জয়া অস্বীকার করতে পারে না। তাকে সেদিন নামের মোহ পেয়ে বসেছিল বৈকি! সবাই বলবে, জয়াদির মত বিপ্লবী হয় না। হ্যাঁ, জয়া— পার্টিকে তুমি ঠিকই ভালবাসতে। কিন্তু মনে করে দেখ, প্রশংসার মোহও তোমার কম ছিলনা। শান্তনুর মতো একজন নেতৃস্থানীয় স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তুমি লড়াই করছ—কমরেডরা অবাক বিস্ময়ে তা দেখছে, তোমাকে বাহবা দিচ্ছে, আকাশে তুলে ধরছে—এ-সবের লোভ সেদিন তোমাকে আরও বেপরোয়া করে তোলেনি কি? কমরেড পার্থ রায় তো সুযোগ পেলেই তোমার প্রশংসা করত। পার্টি-সভ্যদের এক সভায় সে বলেছিল, 'কমরেড জয়া আমাদের সামনে আদর্শ। তাঁর মত করে পার্টিকে ভাল না বাসলে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে না।' হৃদয়ের ভালবাসার কথা ভুলে গিয়ে তুমি নিজেকে যন্ত্রে পরিণত করেছিলে সেদিন।

ঘটনাটা ঘটেছিল শান্তনুদের একটা মিটিংয়ে। শান্তনু ছিল সেই মিটিং-এর সভাপতি। একজন বক্তার আপত্তিকর বক্তব্য জয়াদের

দলের ছেলেরা বাধা দেয়; তারপর নানা প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত মাইক নিয়ে টানাটানি। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কে নাকি শান্তনুর মাথায় আঘাত ক'রে বসে। আঘাত অবিশ্যি খুব মারাত্মক ছিল না।

জয়া রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে পার্টি-অফিসে ঘটনাটা শুনল। সেখানে তখন অনেক কমরেড উপস্থিত। তপন বলল, 'জয়াদি, গোলমালের মধ্যে কেমন ক'রে ব্যাপারটা ঘটে গেছে, আমরা বুঝতে পারিনি। শান্তনুদাকে আঘাত করার কোন উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না।'

মুহূর্তের জন্য জয়ার বুকের মধ্যে কি কেঁপে উঠেছিল? আজ আর মনে নেই। বরং মনে আছে, সে বলেছিল, 'তাতে কি হয়েছে তপন! তোমরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভেবে আঘাত করনি—করেছ শত্রুপক্ষ ভেবে। ঠিকই করেছ। সংগ্রাম করতে গিয়ে অত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে?'

পার্থ উঠে দাঁড়িয়ে জয়াকে অভিনন্দন জানাল। বলল, 'কমরেড, আপনি একটা দারুণ পরীক্ষায় সুন্দর ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এই তো চাই। ওরা খুব অপ্রস্তুত বোধ করছিল। আমি ওদের বলেছি, তোমরা এখনও জয়াকে চিনতে পারনি।'

বাড়ি ফিরে দরজার সামনে দাঁড়াতেই জয়া শুনতে পেল টুকুনের কান্না। তার বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘরে ঢুকল।

রাজুর মা বলল, 'দিদিমনি, সর্বনাশ হয়ে গেছে। দেখ এসে দাদাবাবুর কী অবস্থা!'

মাকে দেখেই টুকুন ছুটে এলো—'মামণি, বাপিকে মেরে ফেলেছে।' তার কান্না আর থামে না। মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জয়া বলল, 'না সোনা, ও করম বলতে নেই।'

শান্তনু শুয়ে আছে। চোখ বোজা। কপাল জুড়ে একটা

ব্যাণ্ডেজ। রক্তে ভেজা। আঘাতটা কতখানি কে জানে!

'শান্তনু!' জয়া ধীরে-ধীরে ডাকে।

একবার চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বোজে শান্তনু। কথা বলে না। জয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। সেদিন তার মাথার রক্ত দেখে সে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। আজ তার মধ্যে সে-রকম হচ্ছে না কেন? তাদের ভালবাসা কি তা হলে ফুরিয়ে গেছে? তবুও মনের কোন সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে একটা ব্যথার গুমড়ানো সুর বাজতে থাকে।

'তুমি ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'আঘাতটা খুব বেশি কি?'

শান্তনু চুপ করে থাকে।

'ওরা নাকি বুঝতে পারেনি।' জয়ার কথায় শান্তনু চোখ মেলে তাকায়। জয়া বলে, 'অনিচ্ছায় ঘটনাটা ঘটে গেছে। ওরা খুব দুঃখ করছিল।'

'আমি তো এ-সম্পর্কে কিছু শুনতে চাইনি, জয়া।' খুব ঠাণ্ডা ভাবে বলল শান্তনু।

জয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, আমারও খুব খারাপ লাগছে। বিশ্বাস কর, এ-ধরনের ঘটনা ঘটুক—আমি চাইনি।'

শান্তনু বলল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।' জয়া বুঝতে পারল সে তাকে চলে যেতে বলছে।

কয়েক দিন বাদে শান্তনু তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। জয়া ঘরে ঢুকে দেখল সে উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। তাকে সে লক্ষ করেনি।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল জয়া।

'হ্যাঁ।' তার দিকে মুখ ফিরিয়ে শান্তনু বলল, 'আমি আর

এখানে থাকব না ঠিক করলাম।'

কোন ভূমিকা নেই। খুব সহজ ভাবে কথাটা বলল শান্তনু। বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের চোখাচোখি হল পলকের জন্য। জয়া চোখ নামিয়ে নিল।

যা ঘটছিল, তার পরিণতি এ-ছাড়া আর কী হতে পারত? জবাব দিল না জয়া, কিম্বা তৎক্ষণাৎ তার মুখে কোন জবাব এলো না।

শান্তনুই বলল, 'এ-ভাবে এক সঙ্গে বাস করার কোন মানে হয় না।'

মানে যে হয় না, জয়াও তা জানে বৈকি! বেশ, তবে তাই হোক। শান্তনু যদি পারে, সেও পারবে। একদিন যে-শান্তনুকে সে ভালবেসেছিল, আজকের শান্তনু সে নয়। এ যেন আদর্শচ্যুত এক ভিন্ন মানুষ। জয়ার মনে তার জন্য কোন ভালবাসা নেই। তাছাড়া ভালবাসার চেয়েও বড় জয়ার আত্মমর্যাদাবোধ আর আদর্শ। এ-সব বিসর্জন দিয়ে ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় বলে তার বিশ্বাস নেই।

জয়া দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

আজ জয়ার ভাবতে অবাক লাগে, কত সহজে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তার চোখে ভেসে ওঠে কোর্টের সেই দৃশ্যটা। শান্তনু দাঁড়িয়ে রয়েছে—পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। চোখে কেমন এক রকম উদাস নির্লিপ্ত দৃষ্টি। সে একবারও তাকায়নি তার দিকে। জয়া কিন্তু তাকে সারাক্ষণ লক্ষ করছিল। কোর্টের রায় বেরোবার পর সে জয়ার কাছে এগিয়ে এলো।

'জয়া, যা ঘটে গেল, তার ওপর সম্ভবত আমাদের কোন হাত ছিল না। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই।' শান্তনু জয়ার চোখে চোখ রেখেই কথাগুলো বলল।

আশ্চর্য! সেদিন জয়ার মুখ থেকে একটা কথাও বেরুলো না কেন? মনেই এলো না কী বলা যায় কিম্বা কী বলা উচিৎ। শান্তনু

একটু মৃদু হেসে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

'এ-কি! তুমি সারা রাত বসে-বসেই কাটাবে নাকি?' পার্থ জয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। এতক্ষণে তার খেয়াল হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। বোধহয় ভোর হতে আর দেরি নেই। শুতে যাবার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল।

পার্থর চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। সে তার পাশে এসে বসে।

'তোমার সমস্যাটা কী, আমাকে খুলে বলত' জয়া। আমার জানা দরকার।'

'সমস্যা যে কী—আমি নিজেই তো জানি না। তোমাকে কী বলব?'

'তুমি যদি না বলতে চাও, ভিন্ন কথা। বেশ, তবে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি কি আবার শান্তনুর কাছে ফিরে যেতে চাও? লুকোবার দরকার নেই। যা সত্যি, তাই তুমি বল।'

'না। সেটা একেবারেই অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন? তোমার কার্যকলাপ দেখে আমার তো সেরকমই ধারণা হচ্ছে'

'তোমার ধারণা ভুলও তো হতে পারে। এ-কি পুতুল খেলার সংসার যে যখন খুশি গুটিয়ে নিয়ে আবার এক সময় পেতে নেওয়া যাবে।'

'পেতে নিতে বাধা কী? চিন্তাধারার দিক থেকে তেমরা এখন খুব কাছাকাছি রয়েছ সে তো বোঝাই যায়। তোমার কাছে সে আর শত্রু নয়। হয়ত তার বদলে আমিই এখন শত্রু।'

'আমার কাছে তুমিও শত্রু নও। হলে কি আর সমস্যা থাকত?' জয়া পার্থর মুখে দৃষ্টি রেখে আবার বলতে থাকে, 'পার্থ, তুমি বিশ্বাস কর, তোমাকে প্রতারণা করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি নিজের মনটাকে স্পষ্ট করে বুঝতে চাই। যেদিন বুঝতে পারব,

তোমার কাছে আমি লুকোব না। আর লুকিয়েই বা কি হবে? তাতে কার লাভ?'

পার্থ জয়ার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলে, 'আমার মনে হয়, তোমার রেস্ট দরকার। নইলে তোমার মেণ্টাল ডিপ্রেশন কাটবে না। কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসো। যাবে?'

'ভেবে দেখব।'

জয়ারও মনে হয়, কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও তার যাওয়া দরকার। নইলে মনের এই অস্থিরতা যাবে না। এখানকার পরিবেশ অসহ্য ঠেকছে তার কাছে। সে পালাতে চায় এখান থেকে। টুকুনকে নিয়ে দূরের কোন শান্ত পরিবেশে গিয়ে নিজের মনের মুখোমুখি হবে সে। কিন্তু এই মুহূর্তে শান্তনুকে ফেলে সে কি যেতে পারবে?

পার্থর স্থির দৃষ্টি জয়ার মুখে আবদ্ধ। ধীরে-ধীরে সেই দৃষ্টি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। চোখাচোখি হতেই জয়া কেমন অস্বস্তি বোধ করে। চোখ নামিয়ে নেয়। তার জন্য দুঃখ অনুভব না করে পারে না। মায়াও হয়। নিজেকে অপরাধী মনে করে সে। পার্থর হৃদয়ে এখনো তার জন্য রয়েছে ভালবাসা। জয়া তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে জেনেও সে তাকে ভালবাসে? না পার্থ, তুমি আমাকে ভালবেসো না। বরং তোমার ঘৃণা দিয়ে আমাকে ধিকৃত কর। তাই আমার প্রাপ্য। কথাগুলো মনে-মনে আবৃত্তি করে জয়া।

পার্থ দুই হাত বাড়িয়ে জয়াকে নিজের কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ বাধা দিতে পারে না সে। তার সমস্ত স্নায়ু অসাড় হয়ে পড়ে। এই পার্থকে অস্বীকার করার মত শক্তি তার কোথায়? বলিষ্ঠ দেহের মত সঙ্কল্পে দৃঢ় তার মন। সংশয়হীন। জয়া কেন পারল না তার মত হতে? একদিন' সে তো তার মতই হতে চেয়েছিল। জয়া স্পষ্ট অনুভব করে, পার্থর বুকের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব চলছে। পুরুষের আদিম ভালবাসা উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঈর্ষার

দাবদাহে জ্বলছে তার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা। সে কী করতে চায়? নিজের শক্ত বুকের পাঁজড়ে পিষে ফেলবে তাকে? মেরে ফেলবে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে? পার্থ আজ পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু জয়া! তার দেহটা হঠাৎ কেমন করে বরফ হয়ে গেল! নইলে পার্থর বুকের আগুন কেন তাকে স্পর্শ করতে পারছে না? সে কেন পারছে না সাড়া দিতে?

হঠাৎ খেয়াল হয় পার্থর। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে পায়, তার ভালবাসার আলিঙ্গনের মধ্যে জয়ার নগ্ন সুন্দর দেহটা কান্নার আবেগে কাঁপছে শুধু।

'আমাকে ক্ষমা করো পার্থ। আমি ফুরিয়ে গেছি।'

নিজের অবরুদ্ধ কান্না আর চেপে রাখতে পারে না জয়া। এক সময় সে অনুভব করে, তার শরীর থেকে পার্থর দু'হাতের বাঁধন আপনা থেকে কখন শিথিল হয়ে গেছে। তার বলিষ্ঠ দেহটা হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে গেছে বরফে। ঠিক তার নিজের মত।

৯

সেদিন হাসপাতালে কেতকী এসেছিল শান্তনুকে দেখতে। সে জয়ার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'কেমন আছিস জয়া? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস।' অনেক বছর পর দুজনের দেখা। কেতকী পড়া ছেড়ে দিয়ে সেই যে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তারপর মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। মেদিনীপুরে একটা কনফারেন্স অ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছিল জয়া—তখন। শান্তনুর প্রতি তার দুর্বলতার কথা ইতিমধ্যে সে জেনে গেছে। অনেক চেষ্টা করে শান্তনুর মুখ থেকেই কথাটা বের করেছিল সে। তার মনের মধ্যে তখন কেমন এক অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রণা।

'সত্যি বলছ, তুমি তাকে ভালবাসনি?' জানতে চেয়েছিল জয়া।

'বাসব না কেন?' জবাব দিয়েছিল শান্তনু, 'বন্ধুর মত এখনো তাকে আমি ভালবাসি।'

'কেতকী তার মনোভাব তোমাকে জানায়নি?'

'জানিয়েছিল। চলে যাবার কয়েকদিন আগে।'

'তোমার জন্যই সে পড়া ছাড়ল!'

'সেটা তার বোকামি।'

'বোকামি বলছ কেন? আজ যদি তুমি অন্য কোন মেয়েকে ভালবাস, সেটা আমার লাগবে?'

'ভাল না লাগলেও মেনে নেওয়া উচিত। জোর করে যেমন ভালবাসা যায় না, তেমনি ভালবাসা পাওয়াও যায় না।'

জয়া কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিল, ওর সঙ্গে তোমার

বন্ধুত্ব অনেক দিনের। তবু তুমি কেন তাকে ভালবাসতে পারলে না?'

'জানি না। আরো অনেক ছেলের সঙ্গে তো তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে—তুমিই বা তাদের একজনকে ভালবাসলে না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করেছিল শান্তনু।

শান্তনু এখন সুস্থ হবার পথে। তাকে জেনারেল ওয়ার্ডে সিফট করা হয়েছে। সেলাইন আর অক্সিজেনের নলগুলোও খুলে ফেলা হয়েছে শরীর থেকে। এখন কথাবার্তা বলতে তার অসুবিধা হয় না। সে কেতকীকে কাছে ডেকে টুলটায় বসতে বলল। জয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে রথীনের সঙ্গে কথা বলছিল। তাদের আলোচনার দু'চারটে টুকরো কথা তার কানে এলো।

শান্তনু বলল, 'মাস কয়েক আগে তুমি যে বলেছিলে কলকাতার একটা ভাল স্কুলে অফার পেয়েছ—সেই চাকরিটা নিলে না কেন?'

'নিলাম না,' জবাব দিল কেতকী, 'আমার পক্ষে একই ব্যাপার। তাছাড়া অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম ওখানে— ছাড়তে মায়া হল।'

তার মানে, দু'জনের মধ্যে আজকাল দেখা-সাক্ষাৎ হয়! ভালই তো। এখন আর জয়া তাদের মাঝখানে কোন বাধা নয়। আর শুনতে ভাল লাগছিল না। সে রথীনকে বলল 'চল, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসা যাক।' তারা এসে ষ্টাফ-রুমে ঢুকল।

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, 'প্রফেসর রায়কে আমরা শিগগির ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু কিছু কমপ্লিকেশন থেকে যাচ্ছে। আপনারা ডক্টর সেন-এর সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কী ধরনের কমপ্লিকেশন?' জয়া জিজ্ঞেস করে।

'ব্রেনের ব্যাপার—বুঝতেই পারছেন। বোধহয় প্রফেসর রায়কে ভেলোরে নিয়ে যেতে অ্যাডভাইস করবেন তিনি।'

'ভেলোর!' জয়ার কণ্ঠস্বরে তার উদ্বেগ চাপা থাকে না।

ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'ভয় কি? একেবারে

নিশ্চিন্ত হবার জন্যই সেটা দরকার। ওদের কাছে সব রকম ইনস্ট্রু-মেনটস রয়েছে—যা এখানে নেই। ভাল করে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিৎ।'

রথীনকেও একটু চিন্তিত দেখায়। বেরিয়ে আসার পথে জয়া বলল, 'কাল তুমি ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা করবে?'

'হ্যাঁ।' অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয় রথীন।

ওয়ার্ডে ফিরে আসার একটু পরেই ভিজিটিং টাইম শেষ হয়ে গেল। শান্তনু জয়াকে বলল, 'রোজ-রোজ তুমি কাজকর্ম ফেলে আসছ—আমার জন্য অনেক ক্ষতি হচ্ছে তোমার। এখন তো আমি ভাল আছি—রোজ আসা কি দরকার?'

'বেশ, আসব না।' সংক্ষেপে জবাব দেয় জয়া।

'তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ, জয়া।' কথাটা বলে শান্তনু জয়ার দিকে তাকায়।

'তাই নাকি?' এর বেশি জয়ার মুখ থেকে বেরুল না।

কৃতজ্ঞতা! কথাগুলো কেতকীর সামনে না বললেই কি চল-ছিল না? নাকি ইচ্ছা করেই বলেছে সে! জয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের দূরত্বটুকু তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এ-ভাবে তাকে অপমান করতে পারল শান্তনু?

কেতকী বলল, 'শান্তনু, সময় হয়ে গেছে। আজ উঠি।'

'তুমি কাল আছ?'

'হ্যাঁ। আসব কাল।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কেতকী বলল, 'জয়া, চল—কফি হাউসটা একটু ঘুরে যাই।'

'ওখানে গিয়ে কি হবে—এখন আর ভাল লাগবে না। তার চেয়ে চল, পুকুর-পাড়ে গিয়ে বসি।' দু'জনে কলেজ-স্কোয়ারের ভেতর ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসল।

জয়া বলল, 'একটা প্রশ্নের জবাব দিবি?'

'বেশ তো, জিজ্ঞেস কর।'

'এখন খোলাখুলি বলতে বাধা নেই বলেই বলছি। তুই বোধহয় এখনো শান্তনুকে ভুলতে পারিসনি—তাই না?'

কেতকী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হঠাৎ এই প্রশ্নটা কেন তোর মনে জাগল—জানতে পারি?

'এমনি। একদিন তুই তাকে—'

'ভালবাসতাম তো? হ্যাঁ। কিন্তু সে-তো অনেক বছর আগে।'

'সেই ভালবাসা কি এখন নেই?'

'কি জানি। ভেবে দেখিনি। তোর কি মনে হয়—একটা নিষ্ফল প্রেম এতদিন বেঁচে থাকে?'

'তবে বিয়ে করিসনি কেন!'

জয়ার জেরা শুনে কেতকীর হাসি পায়। সে হেসে বলল, 'বাব্বাঃ—তুই দেখছি আমার মনের গোপন কথাটা বের না করে ছাড়বি না।'

'তা হলে তোর গোপন কথা কিছু আছে? বল না শুনি। আপত্তি কি—এখন তো আমি তোদের মাঝে নেই!'

'সত্যি বলছিস!' কেতকী গভীর দৃষ্টি মেলে জয়ার চোখে চোখ রাখে। এক নজরে সে তাকিয়েই থাকে। জয়া কেমন অস্বস্তি বোধ করে। বলে ওঠে, 'আমার মুখে কী দেখছিস অমন করে?'

'কেন অমন একটা মারাত্মক ভুল তোরা করলি, জয়া?' গভীর শোনায় কেতকীর গলার স্বর।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারে না জয়া। মাথা নিচু করে বসে থাকে কয়েক মুহূর্ত।

'ভুল নয় রে। আমাদের সামনে আর পথ ছিল না।' স্বগতোক্তির মত শোনায় তার কথাগুলো। তারপর আবার সে বলে,

'আমার প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু এখনো দিসনি।'

'এখনো আমি ওকে ভালবাসি কিনা—তাই তো?' হাসতে হাসতে বলল কেতকী, 'তুই কি ভেবেছিস ব্যর্থপ্রেমের দুঃখে আমি বিয়ে করিনি? ওসব ব্যাপার গল্প উপন্যাসের মধ্যেই মানায়—বাস্তবে নয়। বাস্তবের মানুষ একজনকে না পেলেও আর একজনকে নিয়ে অনায়াসে সুখী হতে পারে। ভালবাসা চিরকাল একজনকে আশ্রয় করেই চলবে তার কি মানে আছে? তা হলে তোদের ভালবাসাই বা গেল কেন?'

তবুও জয়ার মনে হয়, কেতকীর মনের গোপন কথাটা গোপনই রয়ে গেল। সে আর পীড়াপীড়ি করল না। বলল, 'চল, এখন ওঠা যাক।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসে কেতকী বলল, 'অনেক বছর বাদে এদিকে এলাম। কেমন মায়া হয় রে পুরনো দিনগুলির জন্য। চল না, ভেতরটা ঘুরে যাই।'

তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেওয়ালে-দেওয়ালে বিভিন্ন ছাত্র-সংস্থার পোস্টার সাঁটা। একটা জায়গায় এসে জয়া অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েক শ ছাত্র-ছাত্রী—তাদের কোলাহলে মুখর ক্যাম্পাস। এক পাশে একটা ছোট্ট ডায়াস—তার ওপর মাইকের স্ট্যাণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে শান্তনু ঘোষণা করছে, এখন আপনাদের সামনে বলবেন কমরেড জয়া দত্ত।'

'দাঁড়িয়ে পড়লি কেন—চল।'

কেতকীর ডাকে মুহূর্তে ছবিটা মিলিয়ে যায়। সেদিন শান্তনু বলেছিল, জয়া আজকের তারিখটা নোটবুকে টুকে রেখো। রেখেছিল জয়া। তবে নোটবুকে নয়, তার হৃদয়ের মধ্যে। তাই তো ঘসে-ঘসেও সে মুছে ফেলতে পারেনি সেই লিখন। নিজের মনে আর্তনাদ করে

ওঠে জয়া। শান্তনু! কেন তুমি আমার এই সর্বনাশ করেছিলে?

কেতকীকে তার বাস-এ তুলে দিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে থাকে টু বী'র অপেক্ষায়। কতক্ষণে আসবে কে জানে? হঠাৎ চারদিকে আতঙ্কিত লোকজনের হৈ চৈ ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিক থেকে কয়েকটা বোমা ফাটার শব্দ ভেসে আসে। পুলিশের গাড়িও দেখা যায়। এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়: জয়াও ছুটতে শুরু করে।

একজন জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে?' ছুটতে-ছুটতে অন্য একজন জবাব দেয়, 'বিদ্যাসাগরকে কেটে ফেলেছে।' আর একজন শুধরে দেয়, 'বিদ্যাসাগরকে ধরতে হলে তো স্বর্গে যেতে হবে। তাঁর ষ্ট্যাচুর মাথা কেটে ফেলেছে।' ওদের মধ্যেই একজন বলে, 'ওই একই হল। তাঁকে জ্যান্ত পেলে কি ওরা ছেড়ে দিত? এর নাম সাংস্কৃতিক বিপ্লব, মশাই!'

হ্যাঁ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব! বাঙালী সংস্কৃতির সিংহ-পুরুষের গলা কেটে ওরা সংস্কৃতির বিপ্লব ঘটাবে! না, দুঃখ করে লাভ নেই। যে পাগলামী শুরু হয়েছে, এর শেষ কোথায়, কেউ কি জানে? হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে জয়ার। কিন্তু এ-রুটে নিশ্চয়ই আজ আর বাস চলবে না। তাকে হাঁটতে হবে ওয়েলিংটন-স্কোয়ারের মোড় পর্যন্ত। তারপর ট্রামে করে গড়িয়াহাট।

১০

অনেক দিন বাদে আজ জয়া কলেজে গিয়েছিল। কিন্তু পড়ানয় মন দিতে পারছিল না সে। ছাত্রীরা তাকে ভালবাসে। তাদের ঠকাতে খুব খারাপ লাগে তার। সে তাদের বলল, 'পড়াতে ভাল-লাগছে না আজ। আর একদিন এই বিষয়ের ওপর আমি বলব। আজ থাক।' পিরিয়ড শেষ হবার আগেই সে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলো।

জয়া প্রফেসরস রুমে এসে একটা চেয়ার দখল করে বসল। দু'পাশের কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা। সামনে লম্বা টেবিলের অপর প্রান্তে কয়েকজন প্রবীণা অধ্যাপিকা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন। জয়া ইচ্ছা করেই সেদিকে গিয়ে বসেনি। একা থাকতেই তার ভাল লাগছে।

জয়া ভাবছে আরো ক'দিন ছুটি নেবে কিনা। এমনি মানসিক অস্থিরতা নিয়ে কোন কাজে মন বসানো যায় না। তার সামনে যে-সব প্রশ্ন আজ অত্যন্ত জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে, সে-গুলোর মীমাংসা আগে দরকার। নইলে তার মনের স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে না। কিন্তু কি ভাবে সে প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করবে? নিজের মনটাকেই যে এখনো সে বুঝে উঠতে পারছে না। ভয় হয়। আবার যদি সে ভুল করে বসে?

আসলে পার্থ নিজেই ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলছে। অযথা সন্দেহ। জয়া তো স্পষ্ট করেই তাকে জানিয়েছে শান্তনুর জন্য সে যতটুকু করছে, সবটাই কর্তব্যবোধের তাগিদে। পনের বছর যে-

মানুষটাকে সে ভালবেসেছে, ছাড়াছাড়ি হলেই কি তার সম্পর্কে সব দায় শেষ হয়ে যায়? এটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকবে না। তা হলে জয়ার কী করার থাকে? কাল অযথা দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল।

পার্থ বিদ্রূপ করে বলল, 'হাসপাতালের স্পেশাল ডিউটি তোমার আর কতদিন চলবে?'

শুনেই জয়ার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, 'এ ছাড়া কি তোমার আর কোন কথা নেই? তোমার মন এত সঙ্কীর্ণ—আমি জানতাম না।'

পার্থ ঘা খেয়ে হঠাৎ থমকে গেল, তারপর বলল, 'তাই বুঝি? নতুন করে আর কী কী জেনেছ আমার সম্পর্কে?'

না, জয়া আর কথা বাড়াবার সুযোগ দেয়নি। সে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে এলো।

পার্থ আর একদিন বলেছিল, 'নিজের সঙ্গে প্রতারণা করো না জয়া। সত্যকে স্বীকার করার মত সাহস তোমার থাকা উচিৎ।'

জয়া জবাব দিয়েছিল, 'আমার সাহস সম্পর্কে হঠাৎ তোমার সন্দেহ দেখা দিল কেন? ভেবো না—প্রয়োজন হলে ঠিকই প্রমাণ পাবে সাহস আমার আছে কিনা।'

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও পার্থকে জয়া ঘৃণা করতে পারে না কেন? এখনো তার ভাল লাগে তাকে। মমতা হয় তার জন্য। তার কী দোষ? সে জয়াকে ভালবাসে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বস্ততা দাবী করার অধিকার তার আছে। জয়াও কি তা করত না তার মনে সন্দেহ দেখা দিলে? আর সে কি জোর দিয়ে বলতে পারে যে তার সন্দেহটা একেবারে অমূলক? দু'দিকের টানা-পোড়েন যে চলছে তার মনে, সে কি জয়া অস্বীকার করতে পারে?

অথচ এই পার্থকে সে-ই তো একদিন ডেকে এনেছিল তার জীবনে? শান্তনু চলে যাবার পর কেমন শূন্য লাগত বাড়িটা। বিশেষ

করে রাত্রির দিকে। নিঝুম বাড়িটা ভৌতিক হয়ে উঠত যেন। টুকুন ভয়ে কাঁদত। জয়ারও মনে হতো, একজন পুরুষ মানুষ বাড়িতে না থাকলে কোথায় যেন একটা শক্তির অভাব থেকে যায়। কিন্তু তার কাছে তখন এ ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। শান্তনু ছাড়া কোন দিক থেকে সে অসহায়, নিজেকেও তা বুঝতে দেবে না জয়া। তবুও পার্থ হয়ত বুঝতে পেরেছিল। সে সময় পেলে প্রায়ই আসত সন্ধ্যার দিকে। পার্টির অফিস ছিল তার আস্তানা। সেখানেই শু'ত। আর তার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল একজন কমরেডের বাড়িতে। জয়াই একদিন প্রস্তাবটা দিল। বলল, 'আমার ছু'টো ঘর তো খালি পড়ে থাকে। ইচ্ছে হলে আপনি এখানেই থাকতে পারেন।' প্রস্তাবটার জন্য সে বোধহয় তৈরি ছিল না। একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'ভেবে দেখতে হবে।' দ্বিধার কারণটা দুর্বোধ্য নয়। তাই সে আর পীড়াপীড়ি করেনি। ব্যাপারটা চাপাই পড়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। গরাদ ভেঙে চোর ঢুকেছিল ঘরে। এর পর টুকুনকে সামলে রাখা মুশকিল হল। সন্ধ্যা হলেই সে চিৎকার শুরু করে দেয় ভয়ে। তখন বাধ্য হয়ে জয়াকে বাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবতে হল। দু'জনের সঞ্চয়ের অর্থে এই ছোট্ট বাড়িখানা তারা কিনেছিল। কিছু ধারও করতে হয়েছিল। ছাড়াছাড়ির সময় জয়া শান্তনুকে বলেছিল, 'বাড়ি তো তোমারও। এটা বিক্রি করে তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও।' সে জবাব দিয়েছিল, 'বেশ তো. আমার অংশটা টুকুনের জন্য রইল। তার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যায় নি।'

বাড়ি বিক্রির কথা শুনে পার্থ একদিন তার জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির! তখন থেকে সে এখানেই আছে। তার আসার পর সে জয়াকে আরো বেশি করে পার্টির কাজে টেনে নিল। ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যাপারে তার পরামর্শ ও সাহচর্য জয়ার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। এমনি করে কখন যে তারা পরস্পরের খুব কাছে চলে

এসেছিল, টের পায়নি কেউ। বুঝতে পেরে জয়া চমকে উঠল। এ-কি সে করতে চলেছে? তার টুকুনের কথা কি একবারও সে ভেবেছে? নিজেকে শাসন করল জয়া। না, তাকে সাবধান হতে হবে।

তারপর তাদের জীবনে এলো সেই সর্বনাশা রাত।

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে জয়া রাজুর মা'র কাছে শুনল, পার্থ অফিসে যায়নি—সারাদিন ঘুমিয়েছে। মনে-মনে হাসল সে। ঘুমের দোষ কি? সারা-রাত জেগে কাটালে দিনের বেলা তো ঘুমুতেই হবে। তারও কি পাচ্ছে না ঘুম? দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার বড় ভয়ঙ্কর। ঘরের আলো নিবলেই সব ঘুম পালিয়ে যায়। তারপর শুরু হয় বিবেকের সঙ্গে লড়াই। একদিকে বিবেক অন্যদিকে মনের কামনা-বাসনা।

জয়া পার্থর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ঘুমিয়েছেন?'

'না।'

'শুনলাম আজ অফিসে যান নি। শরীর খারাপ?'

'না। ভেতরে আসুন।'

জয়া ভেতরে গিয়ে বসে।

পার্থ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলব।'

জয়া এক পলক তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তার মনে হয়, এখন একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে যায় সে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়, পার্থ কিছু বলে না। কিম্বা সে ভাবছে কেমন করে গুছিয়ে বলবে।

'বলবেন না?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে জয়া।

পার্থ যেন জোর করে ভেতর থেকে কথাগুলোকে টেনে বের করে বলে, 'আমার পক্ষে আর এখানে থাকা উচিৎ হবে না, জয়া।'

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এক সময় জয়া বলে,

'বেশ তো। ইচ্ছে না হলে থাকবেন কেন?' কথাটা বলে সে অপেক্ষা করেনি আর।

রাত তখন কত হবে? খেয়াল নেই। তার শরীরের সমস্ত রক্ত গিয়ে যেন মাথায় জমা হয়েছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপির শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। তার সমগ্র চেতনার মধ্যে একটা অদ্ভুত জ্বালা। সইতে পারছিল না জয়া। আজো সে মনে করতে পারে না, কখন কিভাবে সে নিজের বিছানা ছেড়ে পার্থর ঘরের মধ্যে চলে এসেছিল।

'কে?' চমকে উঠেছিল পার্থ।

'আমি—পার্থ, আমি!'

'জয়া!'

'তোমার যাওয়া হবে না। তুমি এত স্বার্থপর! শুধু নিজের কথা ভেবেছ—আমার কষ্টের কথা ভাবলে না?'

'ভেবেছি! এই জন্যই তো চলে যেতে চাই। এভাবে আমরা কেমন করে এই কষ্ট সহ্য করে থাকব?'

'আমরা মানব না এই কষ্ট। কী মানে হয় এই আত্মপীড়নের?

গভীর রাত্রির অন্ধকার তাদের গ্রাস করে নিল।

না, জয়ার অনুশোচনা নেই। সেদিন শান্তনুকে ভাল লাগা যেমন সত্যি ছিল, পরবর্তী জীবনে পার্থকে ভাল লাগাও মিথ্যে নয়। তার জীবনে দু'টি পুরুষের আবির্ভাব সমান সত্য। তাই তো জয়ার আজ এত কষ্ট। কাকে সে অস্বীকার করবে? এক সময় জয়া ভাবত, যেহেতু শান্তনুর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে তার মেলে না, অতএব তাদের ভালবাসাও মরে গেছে। আজ পার্থর মতাদর্শের সঙ্গেও তার মিল নেই। কিন্তু জয়া তো দু'জনের কাউকেই শত্রু বলে ভাবতে পারে না। আসলে মতাদর্শ নয়—ব্যক্তিত্বের যে-ইমেজ পরস্পরকে আকৃষ্ট করে, তাই বোধ হয় নারী-পুরুষের ভালবাসার ভিত্তি!

'জয়াদি!'

চমকে ওঠে জয়া। তার পাশের চেয়ারে বীণা চৌধুরি বসে তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

'কী ভাবছিলেন? দু'তিনবার ডাকলাম—শুনতে পাননি।'

'তাই নাকি!'

'মনে হচ্ছিল, আপনার মনটা এখানে ছিল না—অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল। কোথায়?'

'দূরে নয় রে—কলকাতার বুকেই ঘুরছিল।'

'একা-একা, নাকি সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'খুব ফাজিল হয়েছ!'

দু'জনই হেসে ওঠে।

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বীণা বলে, 'শান্তনুবাবু কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'জানেন, আপনার নামে কী রকম বিশ্রী আলোচনা হচ্ছে এখানে

'কে করছে? বেলা আর তার বন্ধুরা তো?'

'ঠিক ধরেছেন তো আপনি!'

'এ আর এমন কি শক্ত? কী বলাবলি করছে তাও বলে দিতে পারি।'

বেলা শান্তনুদের দলের মেয়ে। জয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনদিন ভাল ছিল না। শান্তনুর ঘটনা নিয়ে সে তার বিরুদ্ধে নানা রকম মন্তব্য করেছে—কলেজে এসেই জয়া তার রিপোর্ট পেয়েছে।

বীণা বলল, 'শান্তনুবাবুকে দেখতে আপনি রোজ হাসপাতালে যান। কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। এ-সবই নাকি ন্যাকামো। নিজেদের অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা।'

জয়া মৃদু হেসে বলে, 'তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আমি

আশা করি না।'

'আমি প্রতিবাদ করেছি তার কথায়,' বীণা বলল, 'এ অত্যন্ত অশোভন।'

জয়ার মনে আছে, যে-দিন ডিভোর্সের রায় বেরিয়েছিল, সে কলেজ করে সোজা কোর্টে গিয়েছিল। তার সঙ্গে গিয়েছিল বীণা।

রায় বেরোবার পর বাড়ি ফেরার পথে বীণা বলেছিল, 'আপনি কেমন করে পারলেন জয়াদি? আমার তো ভাবতেই কান্না পেয়ে যায়।'

'কান্না পাবে কেন?' জবাব দিয়েছিল জয়া, 'সুখ নেই বলেই বিচ্ছেদ। এ তো মুক্তি। বরং আনন্দ হবার কথা।'

বীণার মনটা খুব নরম। জয়ার সঙ্গে তার পরিচয় কলেজে। রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবু তাকে সে খুব ভালবাসে। অথচ দু'জনের জীবনধারায় কোন মিল নেই। জয়ার বাড়িতে সে কয়েকবার গেছে। শান্তনুর সঙ্গেও তার আলাপ ছিল।

জয়া সেদিন বীণাকে কিছুতেই বুঝাতে পারেনি যে, জীবনের ধ্যান-ধারণাগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু জৈবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ভালবাসা বেঁচে থাকতে পারে না। তার লজিক উল্টো। দু'জন মানুষের ধ্যান-ধারণা এক হবে এমন কোন কথা নেই। ভালবাসার ধর্মই হল মানিয়ে নেওয়া। জোর করতে হয় না। আপনা থেকেই এই প্রক্রিয়া কাজ করে।

জয়া জানে, তাদের সমস্যা বীণার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তার জীবনের প্যাটার্ন ভিন্ন। তা ছাড়া জীবনযাত্রায় আধুনিক হলেও পুরুষের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার সংস্কার এখনো রয়েছে তার মজ্জার মধ্যে। তার স্বামী প্রবাল চৌধুরি একটা বড় ফার্মের কোভেনেন্টেড অফিসার। কোম্পানির খরচে দু'তিনবার আমেরিকা ঘুরে এসেছে। বীণার কাছে চাকরিটা হল সময় কাটাবার আর শরীর ঠিক রাখার উপায়। তাদের জগত আলাদা। তবুও বীণা কলেজে আসে সাদা-

সিধে ধরনে। ভাল নাচতে-গাইতে পারে। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারই মুখ্য ভূমিকা। খুব মিশুক। তাই সবাই তাকে ভালবাসে।

জয়া দু'তিনবার গেছে বীণার বাড়িতে। সি. আই. টি. রোডের ওপর বিরাট ফ্ল্যাট। প্রথমবার গিয়েই বীণার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল জয়ার। ওরা তাদের বাবা-মা'র মতই খুব মিশুক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ষ্টিরিওর মিউজিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করল। ইতিমধ্যে প্রবাল বাড়িতে ঢুকল। বীণা পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল, সে বাধা দিয়ে বলল, 'পরিচয় করাতে হবে না। উনি জয়াদি। তোমার মুখে শুনে শুনে এঁর চেহারাটা আমার মুখস্থ হয়ে হয়ে গেছে।' প্রবাল খুব স্মার্ট: আলাপী। সুপুরুষ।

বীণার মেয়ে টুম্পা তার বাপের হাত ধরে ডাকল, 'ড্যাডি, এসো—তুমি নাচবে আমাদের সঙ্গে।'

'আমি! ও মাই গড!'

কিন্তু মেয়ে ছাড়বে না। বীণা বলল, 'নাচ না—তুমি কত বড় নাচিয়ে সেটা প্রমান করার এই তো সুযোগ!'

'তা হলে তুমিই বা সুযোগটা ছাড়বে কেন?'

প্রবাল নাটকীয় ভঙ্গীতে বীণার সামনে এসে দাঁড়ায়—তার দু'টো হাত ধরে টানে। রেহাই পাওয়ার জন্য সে চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়ে দু'টো আনন্দে হাত-তালি দেয়।

টুম্পা বলে, 'হ্যাঁ মামি, এসো না। আমরা সবাই মিলে নাচব।'

রেকর্ডটা আবার গোড়া থেকে চালিয়ে দিয়ে ওরা চারজনে মিলে নাচল। এ-সব ইংলিশ ড্যান্স জয়া বোঝে না, এবং এ-সব ব্যাপারে তার বিরূপ ধারণাই রয়েছে। তবু সেদিন ভাল লাগল। এ যেন আনন্দময় প্রাণের উদ্দাম উচ্ছাস। বেশ কেটেছিল সন্ধ্যাটা।

এর নামই কি সুখ! হ্যাঁ, সুখ বৈকি। জয়া অস্বীকার করতে

পারে না। তবে এ জাতের সুখ জয়া কোনদিন চায়নি। বীণা আর তার স্বামীর সামনে রয়েছে শুধু একটা ছোট্ট জগত—অফিস আর বাড়ি, আর তাদের দু'টি ছেলে-মেয়ে। এই ছোট্ট জগত ঘিরে গড়ে উঠেছে তাদের সুখ-স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্খা। এর বাইরে ভারতবর্ষ নামক একটা বিরাট দেশ আছে সেখানে কত অসংখ্য মানুষ তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে সি. আই. টি রোডের অমন সুন্দর ফ্ল্যাটে বাস করার স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা, বস্তীর পঁচা দুর্গন্ধময় পরিবেশেও একটু আশ্রয় সংগ্রহ করতে পারে না—তাদের দুঃসহ বঞ্চিত জীবনের হাহাকার বীণাদের জগতে অজানা। তাদের আগ্রহ নেই নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের সংগ্রাম নিয়ে। ভিয়েতনামের জঙ্গলে মরণপণ যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য কত মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, তাদের জন্য সমব্যথার স্থান নেই সেই জগতে। চীন আর রাশিয়ার বিরোধে কেমন করে পৃথিবীজুড়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরেছে—তার কোন গুরুত্ব নেই কোভেনেন্টেড অফিসার প্রবাল চৌধুরি আর বীণা চৌধুরির জগতে।

না, বীণার মত করে সুখী হতে জয়া চায় না। হয়ত একদিন চাইত। শান্তনুর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে। মনে আছে জয়ার। তখন সে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। ছোট্দার সবে বিয়ে হয়েছে। ছোট-বৌদিকে নিয়ে ছোট্দা যা আদেখলাপনা করত, সে-সব দেখে তার মনেও ভবিষ্যতের একটা ছবি কল্পনায় ভেসে উঠত বৈকি। কিন্তু সব ওলট-পালট করে দিল শান্তনু। সে তার চোখের সামনে তুলে ধরল অন্য এক জগতের ছবি। এই জন্য জয়ার দুঃখ নেই। ভালই হয়েছে। একটা ছোট্ট জগত নিয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ? জীবন তো একটাই—তাকে যদি বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত করে না নেওয়া যায়, তবে জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই বৃহৎ জগতের সঙ্গে তাকে একাত্ম করে দেওয়ার জন্য জয়া শান্তনুর কাছে ঋণী।

'জয়াদি!'

বীণার ডাকে সম্বিত ফিরে আসে জয়ার। একটু লজ্জিত হয়ে বলে, 'শরীরটা ভাল লাগছে না আজ।'

'আপনাকে খুব ডিসটারবড মনে হচ্ছে! চলুন না ছুটির পর আমার বাড়িতে। আমার ওখানেই খেয়ে বিশ্রাম নেবেন। যাবেন?'

'আজ নয়। আর একদিন যাব।'

'আপনার শরীর সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার।'

'এখন থেকে হবো। ভাবছি আর কটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিলে কেমন হয়?'

'তাই নিন।'

উঠে পড়ে জয়া। ছুটির জন্য কথা বলতে প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে যায়।

১১

এ ক'দিন হাসপাতালে যেতে পারেনি জয়া। তার নিজের শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রেসার। মাথা ঘোরে। ডাক্তারের নির্দেশে তাকে রেষ্ট নিতে হচ্ছে।

একদিন রথীন এসেছিল তাকে দেখতে। জয়া তো অবাক।

'কি ব্যাপার রথীন!'

'আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি অসুস্থ!'

'ও কেমন আছে?'

'মাথার সেই ব্যথাটা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। এখন ভাল।'

'ওকে ভেলোরে কবে পাঠাচ্ছ?'

'মুশকিল হয়েছে—ও যেতে চায় না। আমার মনে হয়, খরচ-পত্রের কথা ভেবেই ওর আপত্তি।'

'কেন, আমি তো তোমাকে সেদিন বলেছিলাম টাকার জন্য আটকাবে না। আমি দেব।'

রথীন চুপ করে থাকে।

'কথা বলছ না যে?'

'আমি বলেছিলাম। সে রাজি হয়নি।'

'তুমি কি আমার কথা বলেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তবেই হয়েছে! তোমার কী বুদ্ধি! আমার টাকা ও নেবে—তুমি ভাবলে কেমন করে?'

'বলতে তো হবে কোথায় পেয়েছি। পার্টির সাহায্যও সে নেবে না।'

'কেন? তাতে আপত্তি কী?'

রথীন আবার চুপ করে যায়। একটু পরে বলে, 'এসব কথা তোমাকে বলা ঠিক হবে না জয়া। এ নিজেদের ভেতরকার ব্যাপার। শোন। আপাততঃ সমস্যা হল—শান্তনুর জন্য একজন সব সময়ের ভাল কাজের লোক পাওয়া। দিন তিনেকের মধ্যে সে ছাড়া পাচ্ছে। তোমার খোঁজে আছে কেউ?'

'দেখবো। কাল আমি হাসপাতালে যাচ্ছি- খবর পাবে।'

রাজুর মা চা দিয়ে গেল দু'জনকে। তাকে সামনে দেখে হঠাৎ জয়ার মনে হল, অসুস্থ শান্তনুকে দেখাশোনার জন্য এবং সংসারের সমস্ত কাজ করার জন্য রাজুর মা হল সব চেয়ে উপযুক্ত। অন্য লোক তার মত দরদ দিয়ে শান্তনুর যত্ন নেবে না। জয়া ঠিক করল তাকেই দিয়ে দেবে। অবিশ্যি তার নিজের খুব অসুবিধা হবে। হোক।

বিকেল হতেই জয়া কেমন অস্থির বোধ করতে লাগল।

সে ভেবেছিল আজ হাসপাতালে যাবে না। শরীরটাও দুর্বল ঠেকছে। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত না গিয়ে সে পারল না। ভেতর থেকে কে যেন তাকে ঠেলে তুলে দিল বিছানা থেকে।

শান্তনুর ওয়ার্ডে ঢুকতে গিয়ে দূর থেকেই জয়া দেখতে পেল তাকে। সে-ও তাকে লক্ষ্য করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কাছে যেতে সে বলল, 'তোমার অসুস্থ শরীর নিয়ে আজ এলে কেন?'

'এসেছি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে।'

শান্তনু হাসল। সামনের টুলটা দেখিয়ে বলল, 'তার আগে একটু বিশ্রাম করে নাও। হাঁপাচ্ছ।' সত্যিই জয়া তখন হাঁপাচ্ছিল। মাথাও ঘুরছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর সে সুস্থ বোধ করল।

'তোমার শরীর কেমন? মাথার যন্ত্রণাটা আছে?'

'না।'

'তা হলেও তোমাকে ভেলোরে যেতে হবে।'

শান্তনু জবাব দেয় না। হাসে।

জয়া গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমি এই জন্যই আজ এসেছি। রথীনের কাছে শুনে থাকতে পারলাম না। তোমাকে কথা দিতে হবে।'

শান্তনু বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। পুরনো দিনের কোন স্মৃতি কি তার মনে ভেসে উঠেছে? সে জয়ার চোখে দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন আনমনা।

শান্তনু মৃদুস্বরে বলল, 'জয়া, তুমি আমার জন্য যা করতে চেয়েছ, তা আমার মনে থাকবে। কিন্তু আমাকে মাপ করো। যা সম্ভব নয়, তা আমাকে করতে বলো না।'

জয়া বলল, 'তুমি কি ধার হিসেবেও নিতে পার না?'

'না।'

'তা হলে বাড়িটা আমি বিক্রি করে দিচ্ছি। বাড়ির অর্দ্ধেক তোমার। তোমার টাকা আমি তোমাকে ফেরৎ দেব। তাতে তোমার আপত্তি হওয়া উচিৎ নয়।'

'কিন্তু আমার অংশ তো আমি টুকুনকে দিয়েছি।'

'না। টুকুন সে-বাড়িতে থাকে না। থাকবেও না কোনদিন।'

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না। এক সময় জয়া বলল, 'অবুঝ হয়ো না, শান্তনু। ভেবে দেখ। আমাদের লৌকিক সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে বলে কি সব শেষ হয়ে গেছে? টুকুন রয়েছে। সে যে তোমার আমার মধ্যে সেতু বেঁধে রেখেছে। সেটাকে তুমি অস্বীকার করতে পার? সে যে আমাদের সব। তার জন্যই তোমাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে।'

শান্তনু কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। টুকুনের জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছিলাম। আপাততঃ না হয় সেটাই কাজে লাগানো যাবে।'

যাক। একটা সমস্যার মীমাংসা হল। জয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তা হলে আমি রথীনকে বলে দিচ্ছি সব ব্যবস্থা করতে। আর একটা কথা। রথীন একজন কাজের লোকের জন্য বলেছিল। আমি ভাবছি রাজুর মাকে দিয়ে দেব।' শান্তনু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, জয়া তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আগে আমার কথাটা শোনই না। রাজুর মা নিজেই আমার বাড়ির কাজ ছেড়ে দেবে বলছিল কিছুদিন ধরে। তার নাকি ভাল লাগছে না। তাকে নিলে তোমার অনেক সুবিধে হবে। আর সব চেয়ে বড় কথা, টুকুন এসে মাঝে-মাঝে তোমার কাছে থাকতে পারবে। রাজুর মা থাকলে তার কোন অসুবিধে হবে না থাকতে।'

জয়া জানে এর পর আর আপত্তি করবে না শান্তনু। তাই সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে এ-টুকু বলা ছাড়া উপায় ছিল না। তার অনুমানই

ঠিক। শান্তনু শুধু বলল, 'তোমার অসুবিধে হলে তাকে দেবার কোন দরকার নেই।'

জয়াকে মিটসেফ থেকে আপেল আর ছুরি বের করতে দেখে শান্তনু বলে ওঠে, 'আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছেটা কখন হবে? নিজের হাতেও নিয়ে খাও না।'

তার আপত্তি অগ্রাহ্য করেই জয়া আপেলটাকে ছুরি দিয়ে পাতলা ফালিফালি করে কেটে প্লেটের ওপর রাখে। একটা টুকরা শান্তনু দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, 'খাও।'

শান্তনু ভয় পেয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে, 'না না—আমি নিজেই খাচ্ছি।'

তার ভয় দেখে জয়া একটু অপ্রস্তুত হয়। হাসিও পায়।

'কেন, আপত্তির কী আছে? নার্সরা তোমাকে খাওয়ায় না? আমিও কতদিন খাইয়েছি—অবিশ্যি, তখন তোমার আপত্তি জানাবার শক্তি ছিল না।' বলতে বলতে জয়া হাসে। শান্তনু চুপ করে থাকে। সে নিঃশব্দে এক টুকরো আপেল প্লেট থেকে তুলে নিয়ে মুখে পোরে।

'আজ রথীন আসতে এত দেরি করছে কেন?

'সে এসেছিল। তুমি আসার একটু আগেই চলে গেল—কী নাকি জরুরী কাজ আছে। সে-ই তো বলে গেল, তুমি অসুস্থ।'

জয়া উঠে গিয়ে ওয়ার্ড-বয়কে দিয়ে এক গ্লাশ গরম জল আনিয়ে হরলিক্স বানালো। শান্তনু বুঝতে পারল আপত্তি করা বৃথা। হরলিক্স-এর গ্লাশে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'তোমার স্বাস্থ্যটা সত্যিই খুব ভেঙ্গে গেছে। যত্ন নেওয়া দরকার। কিছুদিন পার্টির কাজ বন্ধ রেখে আগে শরীরটা ঠিক করে নাও না কেন? আমাকে তো খুব উপদেশ দিচ্ছ!'

'পার্টির কাজে শরীর খারাপ হয় নি। আমি পার্টি করি না।'

শান্তনুর চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

'আমি পার্টি ছেড়ে দিয়েছি।' বলেই জয়া শান্তনুর দিকে মুখ তুলে তাকায়। সেখানে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিছু বলে না সে। জয়ার জানতে ইচ্ছা করে তার এই নির্লিপ্ততা ইচ্ছাকৃত কিনা। তার সম্পর্কে শান্তনুর কি কোন আগ্রহ বা কৌতূহল আর নেই? জয়া তার কাছে আরো দশজন মেয়ের মতই একজন? পরস্ত্রী শুধু?

শান্তনু বালিশের তলা থেকে একটা ছোট্ট রুমাল বের করে জয়ার হাতে দিয়ে বলল, 'সেদিন টুকুন ফেলে গিয়েছিল।'

জয়া একদিন টুকুনকে নিয়ে এসেছিল। তাকে পেয়ে শান্তনুর চোখে আনন্দ ধরে না। মেয়েকে কাছে বসিয়ে সারাক্ষণ দু'জনে কত গল্প! সেদিনও জয়া আপেল কেটে দিয়েছিল— শান্তনু প্রথমে খেতে চায়নি। তারপর মেয়ের ধমক খেয়ে সোজা হল। টুকুন নিজের হাতে আপেল আর সন্দেশ খাইয়েছে তার বাপিকে। শান্তনু শুয়ে থেকে হা করেছে আর সে একটু একটু করে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে। জল খাইয়ে নিজের রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছে দিয়েছে। তারপর তাদের ফিস-ফিস কথাবার্তা আর শেষ হয় না।

রথীন হাসতে-হাসতে বলেছিল, 'চল জয়া, বাইরে থেকে চা খেয়ে আসা যাক। আজ এখানে আমরা নিতান্তই অবাঞ্ছিত!'

শরীর ভাল নেই বলে জয়াকে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়তে হল। শান্তনুই তাকে তাগিদ দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছে।

নিজের স্টপেজে এসে বাস থেকে নেমেই জয়ার নজরে পড়ল মোড়ে অনেক লোকের ভিড়। বেশির ভাগ দলের ছেলে। আবার কি কোন গণ্ডগোল হল! রাস্তার মোড়গুলো রাজনীতির প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে আজকাল। যে এলাকা যে দলের দখলে, মোড়গুলো সেই এলাকার সদর গেট। দলের শান্ত্রীরা সব সময় পাহারা দেয়।

জয়া সামনেই পেয়ে গেল সুজিতকে।

'আজ আবার কী হল, সুজিত?'

'জয়াদি, কেষ্টকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে।'

কেষ্ট! জয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছু বলতে পারে না। এই তো কিছুদিন আগে তার সঙ্গে দেখা! তপনকে ধরার দুঃসাহসিক কাহিনী বর্ণনা করল জয়ার কাছে। সে কি জানত এত তাড়াতাড়ি তার নিজের পালা আসবে! কেষ্ট সম্পর্কে জয়ার ধারণা আগে খুব ভাল ছিল না। সারাদিন মোড়ের চা-এর দোকানে আড্ডা দিত। লুম্পেন চরিত্রের ছেলে। যেতে-আসতে কতবার তার মুখে অশ্লীল মন্তব্য শুনেছে সে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা হবার পর তার মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা গেল। পার্টির মিছিলে যাওয়া, চাঁদা তোলা, কাগজ বিক্রি করা, গণ্ডগোল বাধলে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া—এ সব কাজের মধ্যে একদিন সে পার্টির কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। প্রাণের ভয় কাকে বলে সে জানত না। সহকর্মীদের জন্য তার মমতাও কি কম ছিল? জয়া নিজেই তো দেখেছে। অন্য দলের হাতে নিহত কমরেড শম্ভু পালের মৃতদেহের পাশে বসে কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে গেল। তার দু'চোখে তখন জ্বলছিল আগুন। প্রতিশোধের সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল পেশি।

সুজিত বলল, 'আমরা বুঝতে পারিনি। একটা প্রাইভেট কার থেকে তিনজন নামল। একজন মহিলাও ছিল তাদের সঙ্গে। কেষ্টকে ওরা কেশবদার বাড়িটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করল। সে বাড়িটা দেখাবার জন্য পেছন ফিরতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারা তার মাথায় রড মেরে সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। তিনজনের হাতে তিনটা রিভলবার। যারা স্পটে ছিল তারাও এগোতে পারল না।'

একেই বোধ হয় বলে 'রিটারনড ইন দ্য সেম কয়েন।' যার রাজনৈতিক পরিভাষা 'বদলা'! কী বলবে জয়া? এই তো আজকের রাজনীতি। এলাকা দখল আর প্রতিশোধ। অস্ত্র সবার হাতেই রয়েছে। কোন পক্ষ কি স্বেচ্ছায় এই অস্ত্র ত্যাগ করে বলবে—'এ

ভাবে আর শক্তিক্ষয় নয়। এসো আমরা মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। তাদের বেছে নিতে দাও পছন্দমত নীতি। তারাই আসল শক্তির উৎস—তাদের নিষ্ক্রিয় রেখে কোন দেশে কোন কালে ইতিহাস তৈরি হয়নি।'

বাড়িতে এসে জয়া একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ে। সেদিন সে শুভেন্দুকে সিনিক ও সুবিধাবাদী বলে ধিক্কার দিয়েছিল। স্ত্রীর সামনে অপমানটা হজম করে নিয়ে সে বলেছিল, 'তোমাদের সুইসাইড-স্কোয়াডে সামিল না হওয়া যদি সুবিধাবাদ, তবে আমি তাই। কিন্তু তোমাদের ভূমিকাও খুব গৌরবের নয়। তোমরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি জানি, তোমাদের তথাকথিত বিপ্লবের পেছনে স্বনামে বেনামে বুর্জোয়ারা আর বড় ব্যবসায়ীরা কি ভাবে মোটা ক্যাপিটেল ইনভেস্ট করছে। তাদের লাভের আশা একটাই—তোমরা নিজেরাই যেন নিজেদের ধ্বংস করতে পার। দেখে মনে হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য সার্থক হতে দেরি নেই।'

শুভেন্দুর কথা সেদিন জয়া বিশ্বাস করেনি। আজো করে না। তবে এ-ও সত্যি, তারা তো এর সুযোগ নিতে চেষ্টা করবেই। সে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তপনদের দলের ছেলেরা একটা বুর্জোয়া পার্টির প্রভাবাধীন পাড়ায় আশ্রয় পেয়েছে। শুধু তাই নয়। সেই দলের ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশেই তারা অন্য দলের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে—নীতির প্রশ্ন নেই। লক্ষ্যহীন উন্মাদনা। এর পরিণাম একটাই। রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। তারা ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। অথচ এই সাধারণ মানুষদের নিয়েই না তারা সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে!

কেষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে বিশ্বস্ত সৈনিক। তার বুকে ঘৃণা জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘৃণার অস্ত্র সে আসল

শত্রুর ওপর নিক্ষেপ করতে পারল না। এমনি করে কত ধারালো অস্ত্রের অপপ্রয়োগ হচ্ছে আজ! কত কেষ্ট কত তপন রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ইটে-বাঁধানো শহীদ-বেদী হয়ে এক ব্যর্থ বন্ধ্যা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকবে।

জয়ার বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা গুমড়াতে থাকে। তপন আর কেষ্টর মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে মনে-মনে বলে, 'কেন তোমরা বুকের আগুন দিয়ে বিপ্লবের মশাল বানিয়ে প্রমিথিউসের মত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের জীবন আলোকিত করতে পারলে না? যদিও সেটাই ছিল তোমাদের জীবনের ব্রত, তবু ভ্রাতৃঘাতী কলঙ্কে কালো হয়ে রইল তোমাদের হাত!'

না, দুঃখ করবে না জয়া। ইতিহাস তার প্রাপ্য আদায় করবে বৈকি!

১২

পার্থ ক'দিন বাড়িতে আসেনি। আজকাল খুব সাবধানে থাকতে হয় তাকে। এক রকম পলাতক জীবনই চলছে। চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হয়েছে। আই-বি'র লোকরা নাকি তার অফিসের চারপাশে ঘুরছিল একদিন। কোনরকমে পালিয়ে এসে পরদিন থেকে অফিসে যাওয়া বন্ধ করেছে পার্থ। তার দু'দিন বাদেই বাড়িতে পুলিশের হানা।

রাজুর মা'র ভীত সন্ত্রস্ত ডাকে তাড়াতাড়ি ঘুম-চোখে বিছানা ছেড়ে উঠল জয়া :

'কী হয়েছে?'

'পুলিশ। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে!'

'তার জন্য তুমি ভয়ে কাঁপছ কেন ?'

'দরজা খুলতে বলছে।'

জয়া পরনের শাড়িটা একটু গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'কে আপনারা ?'

'আমরা থানা থেকে আসছি। দরজা খুলুন।'

জয়া দরজা খুলে দেয়। ভোর হয়ে এসেছে। সামনের নিম গাছটার ডালে নানা জাতের পাখির মেলা বসে গেছে।

একজন অফিসার তার সঙ্গে আরো দু'জন লোক নিয়ে ঘরে ঢুকে সারাটা বাড়ি সার্চ করল। বাথরুম পর্যন্ত বাদ যায়নি। আকাঙ্খিত কাউকে না পাওয়ার নৈরাশ্য তাদের চোখে মুখে।

একজন বলল, 'আমি তো বলেছিলাম স্যার, ওরা ভীষণ সেয়ানা। বাড়িতে পাবেন না।'

'তাই তো দেখছি', অফিসারটি বলল, 'কিন্তু আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না কেউ।' তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পার্থ রায় বাড়িতে আসেন না ?'

জয়া মৃদু হেসে বলে, 'এলেই কি তার খবর আমি আপনাদের বলব ?'

অফিসারটির চোখে ভ্রূকুটি। তারপর সে বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় কী নির্লিপ্ত ভঙ্গী তার !

যতক্ষণ পুলিশ থাকে, ততক্ষণ শুধু পাড়ায় দখল দলের হাত-ছাড়া হয়ে যায়। তারা চলে গেলে আবার দখল ফিরে আসে। ঘণ্টাখানেক বাদে ছেলেরা এসে খোঁজ নিয়ে গেল। জয়া বলল, 'পার্থর সঙ্গে দেখা হলে বলো সাবধানে থাকতে। পুলিশ তাকে ধরতে চেষ্টা করছে।'

তারপর থেকে পার্থর দেখা নেই। কোন খবরও পাঠায়নি সে। জয়া জানে, নিরাপত্তার ব্যাপারে সে খুবই সতর্ক। কোন ত্রুটি ঘটবার

উপায় নেই। তা বলে কোন খবরও কি পাঠান যায় না কারুর মারফৎ? জয়ার খোঁজও তো নেওয়া উচিৎ তার। সে যে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছে, সেটা কি সে ভুলে গেছে?

রাত অনেক হয়েছে। ঘুম আসছিল না বলে জয়া একটা বই পড়ছিল। হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ার শব্দ শুনে সে চমকে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায়। দু'টো বেজে গেছে। এত রাত্রে কে এলো? তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে সে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'জয়া!' পার্থর গলা।

জয়া দরজা খুলে দেয়। পার্থ ঘরে ঢুকেই বলে, 'রাজুর মাকে বল চার কাপ চা করতে।'

জয়া নিজেই স্টোভ ধরিয়ে পাঁচ কাপ চা বানালো। এক কাপ তার নিজের জন্য। ট্রেতে করে চা নিয়ে এসে সে দেখল, পার্থ একটা ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে তার কয়েকটা জামা-কাপড় পুরেছে।

'ওদের ডাকো।'

'ওরা ভেতরে আসবে না। দাও—দিয়ে আসছি।'

পার্থ ট্রে-টা হাতে নিয়ে বাইরে গেল। জয়া বুঝতে পারে। বাকি তিনজন বাইরে পাহারা দিচ্ছে। আজকাল সে একা চলাফেরা করে না। সঙ্গে কয়েকজন থাকে, আর নিশ্চয়ই তারা নিরস্ত্র নয়।

পার্থ ফিরে এসে বলল, 'তোমার শরীর কেমন?'

'ভাল।'

'রাজুর মাকে দেখছি না!'

'সে নেই। অন্য একটি মেয়ে কাজ করছে। ছোট মেয়ে—ঘুমুচ্ছে এখন।'

পার্থর চোখে কৌতুহল। জয়াও কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। শেষপর্যন্ত সে না বলে পারে না।

'রাজুর মা শাশুড়ির কাছে গেছে। তার একজন ভাল লোক

দরকার -দেখাশোনা করার জন্য। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

পার্থর মুখ হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে চা খেতে থাকে সে।

একজন এসে দরজার সামনে দাঁড়ায় ট্রে-টা নিয়ে। জয়া এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে সেটা নিয়ে আসে। চেনা মুখ। তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

জয়ার কাছে কেমন অদ্ভুত লাগে। দু'জন মুখোমুখি বসে। বেশ কয়েকদিন পর তাদের দেখা। অথচ তারা বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছে না। এ কেমন করে হয়? রাজনৈতিক মতবিরোধ ছাড়া মনোমালিন্য ঘটেনি। ঝগড়া হয় নি। পরস্পর সম্পর্কে বিশ্বাস বোধ হয় এখনো অক্ষুন্ন আছে। তবুও তাদের প্রাণে ভালবাসার উত্তাপ নেই কেন? নিজেদের অজ্ঞাতে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে যেন একটা চির ধরতে শুরু করেছে।

পার্থ চা-এর কাপটা নিচে রেখে বলল, 'আমাকে উঠতে হবে। আমি কখন কোথায় থাকব ঠিক নেই। তুমি তোমার সুবিধে মত বন্দোবস্ত করে নিয়ো।'

জয়া বলল, 'তোমার টাকা লাগবে? দেব?'

'না।' মৃদু হেসে জবাব দিল পার্থ। তারপর ঝোলা-ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আলো নিবিয়ে জয়া শুয়ে পড়ে। আজ বোধ হয় ঘুম আর হবে না। ঘুম না হলেই যত রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ঢোকে।

শান্তনু তার বাসায় এসেছে। তার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগের দিন রথীন বলল, 'যাবে? চল না ওর বাসার অবস্থাটা কী রকম দেখে আসি। দরকার হলে একটা লোক ডেকে পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া যাবে।'

জয়া বলল; 'দরকার কি? কাল ভোরে রাজুর মা আসছে—

সে-ই করবে ' তারপর কী ভেবে আবার বলল, 'ঠিক আছে। চল, দেখে আসা যাক।'

রথীন চাবি বের করে ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে নাকে লাগল। আড়াই মাস ঘর বন্ধ রয়েছে। হবেই। ঘরে ঢুকে জয়া সবগুলো জানালা খুলে দেয়। দক্ষিণ দিকের দু'টো জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ল। জয়া ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখে। পাশাপাশি দু'টো ঘর—একটা বড়, অন্যটা ছোট। রান্না ঘরও আছে। একটা স্টোভ মেঝেতে পড়ে রয়েছে আর গোটাকয়েক বাসনপত্র। বড় ঘরটার টেবিলে, র‍্যাকে, বিছানার ওপর এলো-মেলো ছড়ানো গাদা-গাদা বই। কয়েকটা কাপড় জামা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। দেয়াল জুড়ে মাকড়সার জাল। তক্তাপোষের ওপর মশারিটা কবে টাঙানো হয়েছিল, আর খোলা হয়নি। বোধহয় ওটা কখনো খোলাই হয় না রোজ রোজ টাঙাবার ঝামেলা এড়াবার জন্য। সারা মেঝেতে টুকরো-টুকরো কাগজ আর ধুলোর আস্তরণ।

জয়া হাসতে হাসতে বলে, 'দেখেছ ঘরের চেহারা? একেবারে লক্ষ্মীছাড়া!'

রথীনও হেসে জবাব দেয়, 'তা তো বটেই! লক্ষ্মীছাড়ার ঘর আর কী রকম হবে?' বলেই তাকায় সে জয়ার দিকে।

জয়া রথীনের ইঙ্গিত বুঝতে পারে। সে অপ্রস্তুত ভাবটা গোপন করে বলল, 'ও লক্ষ্মীছাড়া হবে কেন? ওকে যে ছেড়ে গেছে সে মোটেই লক্ষ্মী নয়, বরং অলক্ষ্মীছাড়া হয়েছে বললে ঠিক হয়।'

দু'জনই হেসে ওঠে।

জয়া বলল, 'চাবিটা আমাকে দাও। কাল ভোরে আমি রাজুর মাকে নিয়ে আসব। ও সারাদিন সময় পাবে বাড়িটা পরিষ্কার করার। রান্নার বাসনপত্রও তো কিনতে হবে। রাজুর মা যা খুঁতখুঁতে—ও এসে দেখুক, তারপর যা লাগে কেনাকাটা করা যাবে।'

'ঠিক আছে।' রথীন বলল।

জয়া মশারিটা খুলে ভাঁজ করে রাখল। বিছানার চাদরটা পাল্টানো দরকার। ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে।

'রথীন, আর চাদর আছে কি?'

'দেখতে হবে।' সে চাবির গোছা থেকে পর-পর দু'টো চাবি দিয়ে চেষ্টা করল চামড়ার বড় ভি-আই-পি স্যুটকেসটা খুলতে। পারল না।

'আমাকে দাও।' জয়া রথীনের হাত থেকে চাবি নিয়ে এক বারের চেষ্টাতেই খুলে ফেলল। রথীন অবাক! জয়া মৃদু হেসে বলল, 'আমরা যেবার মুসৌরিতে গিয়েছিলাম সেবার কেনা হয়েছিল স্যুটকেসটা।'

রথীন বলল, 'তুমি খুঁজে দেখ একটা চাদর পাও কিনা। আমি একটু চা-এর ব্যবস্থা করি সামনের দোকান থেকে। চা না খেলে চলছে না।' সে বেরিয়ে গেল।

জয়ার মনে পড়ে, শান্তনু কলেজ থেকে কিছু বকেয়া টাকা পেয়ে জয়ার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'এ-তো হঠাৎ পাওয়া লটারির মত। কোন কাজে লাগিয়ে দাও।' তখন বাইরে যাওয়ার কথাই মনে হয়েছিল জয়ার। দিল্লী হয়ে মুশৌরি যাবার পথে অনেক জায়গা ঘুরেছিল তারা পুজোর সম্পূর্ণ ছুটিটা। রাজনৈতিক হট্টগোলের বাইরে সেই একবার মাত্র তাদের পরস্পরকে একান্ত করে পাওয়া! তারা ভেবেছিল প্রতি বছর একবার করে বেড়াতে বেরুবে পুজোর ছুটিতে। কিন্তু আর হয়ে ওঠেনি। সত্যি, জীবন বড় নিষ্ঠুর। তার একদিকে যেমন অমৃত, অন্য দিকে তেমনি বিষ। যে-রাজনীতি ছিল তাদের এত প্রিয়, সেই রাজনীতিই তাদের জীবনের সব আনন্দ কেড়ে নিল।

স্যুটকেসের ডালাটা তুলতেই জয়ার নজরে পড়ল একটা এলবাম। কৌতুহল বশতঃ এলবামটা হাতে তুলে নিয়ে পাতা উল্টে যেতে লাগল সে। প্রথম পাতায় এনলার্জ করা টুকুনের ছোটবেলার

একটা ছবি। একটা পুতুল কোলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে—মুখে মিষ্টি হাসি। দ্বিতীয় পাতায় একখানা গ্রুপ—তিনজনের—শান্তনু, জয়া আর টুকুন। বাপি আর মামণির কোলে হাত রেখে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছোট্ট টুকুন হাসছে। তৃতীয় ছবিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা গ্রুপ। শান্তনু, রথীন, শুভেন্দু পুরনো আরো অনেক বন্ধু রয়েছে। জয়া বসেছিল ঠিক শান্তনুর পাশে। শেষ ছবিটা দু'জনের—শান্তনু আর জয়ার। বিয়ের পর তোলা। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় জয়ার। হৃদয়ের ঔদার্যের বিচারে শান্তনুর কাছে সে হেরে গেল! তার একখানা ছবিও আজ জয়ার কাছে নেই। একটা তীব্র বিদ্বেষের জ্বালায় সে যেন ধ্বংসের নেশায় মেতে উঠেছিল। যে-সব ছবিতে শান্তনু ছিল, তার প্রত্যেকটিকে সে নষ্ট করে ফেলেছে কিম্বা কোথায় সরিয়ে রেখেছে, আজ আর মনে নেই। তার সমস্ত চিহ্ন সে মুছে ফেলতে চেয়েছিল সেদিন।

খুঁজেপেতে একটা চাদর বের করে স্যুটকেসে চাবি লাগিয়ে উঠে পড়ে জয়া। বিছানার ওপর থেকে ময়লা চাদর ও বইগুলো সরিয়ে ভাল চাদরটা পেতে দেয়। বালিশের ওয়ারগুলোও ময়লা। ছিঁড়েও গেছে দু'এক জায়গায়। জয়া ভেবে রাখে, কাল আসবার সময় গড়িয়াহাট থেকে দু'টো নতুন ওয়ার কিনে আনবে।

রথীন একটি ছেলেকে নিয়ে ঢোকে। চা-এর দোকানের ছেলে। তার হাতে একটা কেটলি ও দু'টো কাপ। দু'জনকে চা দিয়ে সে চলে যায়।

চা খেতে খেতে হঠাৎ জয়া হেসে ফেলে।

'হাসছ যে!' রথীনের চোখে কৌতুহল।

'রথীন, ব্যাপারটা একটু নাটকীয় লাগছে না তোমার কাছে?'

'কোন ব্যাপার?'

'এই যে আমার ব্যাপারটা। শান্তনুর ঘর-সংসার গুছিয়ে দিচ্ছি—'

'হ্যাঁ। একটু অদ্ভুত লাগছে বৈকি! তবে তোমার পক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়।'

'কেন?'

'তোমার তো আগাগোড়া সবকিছুই নাটকীয়।'

'তাই বুঝি?' একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে জয়া বলল, 'বাইরে থেকে দেখে বিচার করলে হয়ত তাই মনে হয়। কিন্তু তুমি তো বাইরের লোক নও। আমার জীবনে সবচেয়ে যা স্থায়ী, সেটা তোমার বন্ধুত্ব। তোমার তো আমাকে বুঝতে ভুল হবার কথা নয়।'

'ভুল হবে কেন? ঠিকই বুঝি। শান্তনুই তোমাকে বুঝতে ভুল করেছিল—এখন মনে হয় সেই ভুল কিছুটা ভেঙেছে।'

'তাই নাকি?' অবাক হয় জয়া।

রথীন বলে, 'একটা ব্যাপার কিন্তু ভাবতে ভারী মজা লাগে।' জয়ার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। রথীন বলতে থাকে, 'রাজনীতি নিয়েই তোমাদের বিচ্ছেদ। সেদিন নিজের নিজের পার্টিকে তোমরা বিবাহিত জীবনের চেয়েও বড় মনে করেছিলে—অথচ আজ তোমরা দু'জনই তোমাদের পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী!'

হ্যাঁ, শান্তনুর ব্যাপারটা জয়া শুনেছে বৈকি! তাদের পার্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ চলছে। রথীনই বলেছিল। শান্তনু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে। জয়া জানে, ইনার স্ট্রাগল বড় বিশ্রী। বন্ধুও শত্রু হয়ে যায়। বোধহয় এইজন্যই শান্তনু পার্টির সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিল। যাদের সঙ্গে তার মতবিরোধ, তারা প্রথমদিকে দু'চারদিন তাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিল—তারপর আর ও-মুখো হয়নি। আগে জয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল, পার্টির কাজে ব্যস্ততার জন্যই তাদের আসা হয়ে উঠছে না। এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে ব্যাপারটা। হাসি পায় জয়ার। আজকের রাজনীতিতে মানবিক সম্পর্কের কি কোন স্থান নেই?

জয়া বলল, 'শত্রুসুর কথা জানি না। কিন্তু রথীন, আমি তো রাজনীতি বাদ দিয়ে বাঁচার কথা ভাবতে পারিনে।'

'তাহলে পার্টি ছেড়েছ কেন?'

'না ছেড়ে উপায় ছিল না। অবিশ্যি আপাততঃ বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একদিন নতুন করে সবাইকে ভাবতে হবে। সেদিন যদি কাজের সুযোগ আসে, নিজেকে দূরে রাখব না। সেই আশা নিয়ে আমি অপেক্ষা করব।'

হঠাৎ জয়ার খেয়াল হয়। ঘুমের কোন চেষ্টাই সে করছে না। এক নাগারে এটা-ওটা ভেবে চলেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে ফিরে আসে। দুটো জানালা খুলে দেয়। ভোর হতে আর দেরী নেই। এখনো আবছা অন্ধকার। পাখি-গুলি বেরিয়ে আসেনি তাদের বাসা থেকে। নিম গাছটা দাঁড়িয়ে আছে রাশি রাশি সবুজ চিকন পাতার ডালি মাথায় নিয়ে। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে পাতাগুলি। জয়ার ভারী ভাল লাগে রাত্রি ও দিনের এই সন্ধি-ক্ষণটিকে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে থাকে মুক্ত আকাশের দিকে। পার্থর মুখটা ভেসে ওঠে হঠাৎ মনের ওপর। জয়া কি অবিচার করছে তার প্রতি? তার মনে দারুণ অভিমান জমে উঠেছে। বুঝতে পারে জয়া। কিন্তু সে কী করতে পারে? মন অনেক সময় মানুষকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ে নেয়, যা সে করতে চায় না। জয়ার অবস্থাও তাই। পার্থকে ব্যথা দেবার কোন ইচ্ছা তার নেই, তবুও দিতে হচ্ছে ব্যথা। যুক্তি অচল। মনের এমন কিছু ইচ্ছা আছে, যা যুক্তি মানে না। পরিণাম বিবেচনা করে না। অন্ধ আবেগে চলতে থাকে।

আস্তে আস্তে আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। দু'তিনটা শালিক কোথা থেকে উড়ে এসে নিমগাছটার ডালে কিচির-মিচির শুরু করে দেয়। জয়ার চোখের সামনে আবির-রাঙা আকাশ। ভোরের তরুণ সূর্য। রাত্রির ঘোর কেটে যায় তার। সে চেয়ে দেখে সামনের রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষ চলেছে ট্রেণ ধ

১৩

মাকে আসতে দেখে টুকুন উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, 'বাপি দেখ, মামণি এসেছে।' সে ছুটে এসে মা-এর হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। যেতে যেতে অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, 'তুমি এতদিন আসনি কেন?' জয়া মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। ছল-ছল করছে চোখ দু'টি। সে বলে, 'তুমি না এলে আমার খুব খারাপ লাগে, মামণি।'

জয়া মেয়ের মনটাকে হালকা করে দেবার জন্য বলে, 'বাঃ রে—তোমার বাপির কাছে রয়েছ, মন খারাপ লাগবে কেন?'

'ও-সব আমি শুনব না। তোমার রোজ আসা চাই।' টুকুন নিজের দাবীতে অটল।

শান্তনু হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর জয়া একদিন টুকুনকে রেখে গিয়েছিল। আর আসা হয়ে ওঠেনি। তাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া যত সহজ ছিল, তার বাড়িতে আসা তত সহজ মনে হয়নি। কেমন একটা সঙ্কোচ তাকে বাধা দিয়েছে আসতে। নিজেদের সম্পর্কের কথাটা বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে। কিন্তু মেয়েকে সে-কথা বলা যায় না।

শান্তনু বিছানায় শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছিল। সে বইটা পাশে রেখে উঠে বসে।

'এ কি তুমি বই পড়ছ? তোমার না পড়াশুনা বারণ!'

'পড়ছিলাম না—চোখ বুলোচ্ছিলাম।'

'তাই বা করবে কেন? ব্রেণ এর সম্পূর্ণ রেষ্ট দরকার এখন।'

শান্তনু একটু অপ্রস্তুত হয়। সে বলে, 'এ-ভাবে অলসের মত

আমি আর সময় কাটাতে পারছি না।'

টুকুন বলল, 'মামণি, আমি আর বাপিকে একটুও পড়তে দেব না।'

'হ্যাঁ, তাই করো।' জয়া মেয়েকে বলল, 'বাপির দেখাশোনা করবে বলেই তো তোমার আসা।'

টুকুন বিছানার ওপর থেকে বইটা নিয়ে বুক শেল্‌ফের ভিতর রেখে দেয়। তার কাণ্ড দেখে শান্তনু ও জয়া হেসে ফেলে।

রাজুর মা চা নিয়ে ঢোকে।

জয়া বলে, 'সব ঠিকঠাক চলছে তো রাজুর মা?'

রাজুর মা'র বলার আগেই শান্তনু জবাব দেয়, 'ঠিকঠাক মানে? রাজুর মা'র হাতের রান্না খেয়ে আমি তো মোটা হয়ে গেছি কদিনেই। তাছাড়া বাড়ির চেহারা দেখেছ? টুকুন আর রাজুর মা দু'জনে মিলে কী করেছে?'

রাজুর মা বলল, 'দিদিমণি, কি করে যে দাদাবাবু এই ঘরে থাকতেন জানি না। মেঝেতে এই মোটা ধুলোর পলেস্তারা—সারা ঘরে ঝুল!'

জয়া নিজেই তো দেখে গেছে। সে রথীনকে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ঘরের কী লক্ষ্মীছাড়া চেহারা!' আজ আর তা বলবার উপায় নেই। মেঝে, দেয়াল ঝকঝক করছে। জিনিসপত্র সাজানো-গোছানো। দরজা-জানালায় পর্দা ঝোলানো ছিল না—এখন নতুন পর্দা ঝুলছে। কাঠের টেবিলটার উপর পড়েছে একটি সুন্দর পলিথিন-কভার। একটি নতুন বুকশেল্‌ফ কেনা হয়েছে। ভালই হয়েছে। সারা ঘরে বই-পত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল—এখন বুকশেল্‌ফের মধ্যে তারা আশ্রয় পেয়েছে। শান্তনু যে বসে আছে, সেই বিছানার কভারটাও মনে হচ্ছে নতুন।

জয়ার চোখে বিস্ময়। সেটা লক্ষ্য করে শান্তনু হাসতে হাসতে

বলে, 'সাজানো-গোছানোর ব্যাপারটা টুকুনের। তার রথীনকাকুর সঙ্গে গড়িয়াহাটে গিয়ে নিজে পছন্দ করে সব কিনে এনেছে।'

টুকুন লজ্জা পেয়ে মা-এর পিঠে মুখ লুকিয়ে ফেলে। জয়া মেয়েকে আদর করে বলে, 'টুকুন, তুই এই গিন্নীপনা কি করে শিখলি?' সে বুঝতে পারে, এ-সবই তার ছোটমামীর কাছ থেকে শেখা। তার ঘর সাজাবার খুব বাতিক। নিজের ঘরটিকে তো ছবির মত সাজিয়ে রেখেছে। সেটা দেখেই হয়ত টুকুনের এই শখ। ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করে জয়া। তার বাড়িটাকে কেন টুকুন নিজের বাড়ি মনে করে না? ছুটির দিনে মাঝে-মধ্যে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেছে জয়া। যেতে চায়নি সে, এক রকম জোর করেই নিতে হয়েছে। গিয়ে সে চুপচাপ বসে কিম্বা গল্পের বই পড়ে কাটিয়েছে। কেমন যেন সঙ্কুচিত ভাব তার। যেন সে পরের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। অথচ শান্তনুর বাড়িতে এসে সে কত সহজ। এটাকে তার নিজের বাড়ি বলে ভাবতে একটুও দ্বিধা নেই। অথচ শান্তনু কতটুকু করেছে তার জন্য?

'তোমার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে—খাও।' শান্তনু বলে।

একটু বাদে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে টুকুন বলল, 'মামণি, তুমি কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবে না। মাসী বলেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

শান্তনুও বলল, 'যদি অসুবিধে না থাকে থাক না।'

টুকুন-এর দু'চোখে আনন্দ। সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে যেতে দেব না, মামণি। আজ সারাদিন তুমি থাকবে।'

শান্তনু বোধ হয় অনুমান করতে পারে জয়ার মনোভাব। সে বলে, 'সঙ্কোচ বোধ করছ কেন জয়া? তুমিই তো সেদিন বলেছ—টুকুন আমাদের মধ্যে সেতু বেঁধে রেখেছে, যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।'

জয়া চা-এর কাপটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মেয়েকে বলল, 'দাঁড়াও, রান্নাঘরে গিয়ে আগে দেখি—তোমরা অতিথি-আপ্যায়নের কী আয়োজন করেছ।'

জয়ার সংসারে যেমন ছিল, এখানেও রাজুর মা'র ওপর সব দায়িত্ব। বাজার করা থেকে শুরু করে সব। এর মধ্যেই সে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে এই ছন্নছাড়া বাড়িটার মধ্যে একটা ছিমছাম সংসারের শ্রী ফিরিয়ে এনেছে। জয়া এক নজর চোখ বুলিয়েই বুঝল, বাসন-পত্রের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে।

'বুঝলে দি'দিমণি', রাজুর মা হাসতে-হাসতে বলল, 'অমন বাপ-সোহাগী মেয়ে দেখিনি। বাপের কীসে সুবিধা-অসুবিধা, এ ছাড়া মেয়ের আর চিন্তা নেই। বাপও তেমনি।' জয়া নিঃশব্দে শুনে যায়। রাজুর মা বলে, 'টুকুনের খুব ইচ্ছা—এখানে থেকে পড়াশুনা করে। সেদিন দাদাবাবুকে বলছিল তোমাকে বলতে।'

'দাদাবাবু কী বললেন?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে জয়া।

'দাদাবাবু বললেন, তোমার মত না হলে সেটা সম্ভব নয়।'

জয়া গম্ভীরভাবে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মনের মধ্যে একটা জ্বালা। এত করেও সে মেয়ের মন জয় করতে পারলো না। সে পাশের ঘরে এসে দেখে টুকুন উপুড় হয়ে তার বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছে। সে এসে তার পাশে বসে।

'কী হল টুকুন? শুয়ে আছ কেন?' জয়া আদর করে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

'মামণি!' টুকুন উঠে বসে।

'কিছু বলবে আমাকে?' জয়ার মনটা হঠাৎ খুব নরম হয়ে পড়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। কী সুন্দর মায়াভরা দু'টো চোখ! একে কি তার অদেয় কিছু আছে? জয়া বলে, 'আমি জানি তুমি কী বলবে। তুমি বাপির কাছে থাকতে চাও—তাই না?'

'না মামণি,' টুকুন তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'আমি কক্ষনো তোমার অবাধ্য হব না। কিন্তু বাপির জন্য আমার খুব কষ্ট হয়।' তার চোখ ছলছল করে ওঠে। এই বুঝি বর্ষণ শুরু হবে।

জয়া মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপ করে থাকে। কী সে বলবে? কিছুই তো বলার নেই। ছোটদের মনে বাপ-মা'র স্থান যে কতটা, তা কি সে বোঝে না? তাদের বিচ্ছেদ আজ টুকুনকেই আঘাত করছে সবচেয়ে বেশি। সেটাই স্বাভাবিক। জয়া বলল, 'আচ্ছা— আমি ভেবে দেখব। তোমার বাপি ভেলোর থেকে ফিরে আসুক।'

বিকেলে শান্তনু বলল, 'জয়া, টুকুনের জন্মদিন তো প্রায় এসে গেছে। এবার অনুষ্ঠানটা এ-বাড়িতে হলে তোমার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি থাকবে কেন? এক জায়গায় হলেই হল।'

'তাহলে এখানেই হোক। তুমি সকাল-সকাল চলে আসবে। সারাদিন থাকবে।'

টুকুন পাশেই ছিল। তার মুখে খুশির ঝিলিক।

বছরের এই একটা দিনে এখনো তারা মিলিত হয়। অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটে। মাঝে শুধু তিনটা বছর বাদ গেছে। জয়া ইচ্ছা করেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে চায়নি, দু'দিকের টানা-পোড়েনে টুকুনের কচি মনটা ক্ষতবিক্ষত হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না। মেয়ের হাবভাব দেখে শান্তনুকে ডেকে আনতে হল।

'বাপি!'

শান্তনু ও জয়া দু'জনই মেয়ের মুখের দিকে তাকায়।

'আমি কিন্তু আমার তিনজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করব। তাদের বাড়িতে আমি কতবার নিমন্ত্রণ খেয়েছি। আমি তাদের একবারও বলতে পারিনি।'

'বেশ তো, বলো।' শান্তনু সস্নেহে মেয়েকে আশ্বাস দেয়।

জয়া আশ্বস্ত হয়। ভাগ্যিস টুকুন আর কোন আব্দার করে

বসেনি। গতবারের মত! এখন শান্তনুর সঙ্গে জয়ার সম্পর্কটা যতখানি সহজ হয়ে উঠেছে, গত বছর পর্যন্ত এমনটা ছিল না। মাঝে-মধ্যে দেখা হত অল্প সময়ের জন্য। কথাবার্তা হত খুব কম। দু'জনই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত পরস্পরকে।

গত বছর জন্মদিনে হঠাৎ টুকুন বায়না ধরে বসল, তাকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। তার এক বন্ধু নাকি জন্মদিনে জাহাজে চড়েছে। অতএব সে-ও চড়বে। শান্তনু ও জয়া বিব্রতভাবে একজন আর এক জনের দিকে তাকাল। তাদের সমস্যাটা তো মেয়ে বুঝবে না!

'আমি কিছু শুনব না। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।' মেয়ের অনড় দাবী। চোখে দুষ্টুমীর হাসি।

শেষ পর্যন্ত শান্তনুই বলল, 'চল, ঘুরে আসা যাক।' জয়াও আপত্তি জানাতে পারেনি মেয়ের কথা ভেবে।

তারা ট্যাক্সি করে সোজা আউটরাম ঘাটের দিকে চলল। শান্তনু ও জয়ার মাঝখানে বসল টুকুন। দু'জনের কোলে তার দুই হাত। যেতে-যেতে যার দিকে যা দেখছে, সেটা নিয়ে তাকেই প্রশ্ন করছে। সে যেন সচেতনভাবে দু'জনের মধ্যে ব্যালান্স রক্ষা করে চলেছে।

গঙ্গার ধারে টুকুন কখনো আসেনি। নদী, জাহাজ, নৌকো ইত্যাদি দেখে তার কী আনন্দ! জয়ার খুব অনুতাপ হল। টুকুনকে তাদের কত কী দেবার ছিল—অথচ কতটুকু তারা দিতে পেরেছে? তার বয়সের ছেলে-মেয়েরা তাদের বাপ-মা'র সঙ্গে কত বেড়ায়, কত কী দেখে! সেদিক থেকে টুকুন একেবারে বঞ্চিত। রাজনীতির নেশায় সে মেয়ের মনের দিকটা একেবারে উপেক্ষা করে এসেছে এতদিন।

গঙ্গার পাড়ের বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তারা চাঁদপাল ঘাটে এলো। ফেরী-লঞ্চ নদী পারাপার করছে। তারাও একটাতে গিয়ে উঠে বসল। টুকুনের দাবী মেটাতে দু'বার এপার-ওপার করতে হল। মাঝ নদীতে এক ঝাঁক গাঙচিল দেখে সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। একবার সে মাথা নিচু করে জল ছুঁতে যাচ্ছিল—শান্তনু ভয় পেয়ে তাকে জাপটে

ধরে রাখল।

'এই মেয়ে! জাহাজে চড়ার শখ মিটল? এখন বাড়ি চল।' জয়া বলল মেয়েকে।

'বাঃরে—এখনই? আমি আরো ঘুরব—কী বল, বাপি?' বাপের দিকে তাকায় টুকুন। সে ধরেই নিয়েছে, বাপির রায় তার পক্ষেই হবে।

শান্তনু বোধ হয় সরাসরি ডিশিসন দিতে সাহস না পেয়ে একটু দ্বিধার সঙ্গে জয়াকে বলল, 'তোমার কি খুব তাড়া আছে? না থাকলে চল না, চৌরঙ্গীর দিকটা একটু ঘুরে যাওয়া যাক। ও তো দেখেনি কখনো।'

তাই হল। তারা আবার ট্যাক্সি করে চৌরঙ্গীতে এলো। এদিক ওদিক ঘুরল কিছুক্ষণ। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলোর মায়াজাল চারদিকে। টুকুনের চোখে সবই স্বপ্নের মত। বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে সে দেখছে। আর তার বাপিকে অনবরত প্রশ্ন করে চলেছে। জবাব দিতে শান্তনুর ক্লান্তি নেই।

শান্তনু বলল, 'টুকুন, এখন কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়? নিশ্চয় তোমার মামণির খুব খিদে পেয়ে গেছে হাঁটতে-হাঁটতে!'

'তোমার পায়নি?' পাল্টা প্রশ্ন করল টুকুন।

'পেয়েছে বৈকি।' হাসতে হাসতে বলল শান্তনু।

তারপর তারা গিয়ে ঢুকল একটা মিষ্টির দোকানে। টুকুনকে নিয়ে জয়া এসে বসল এক পাশে একটা টেবিলের সামনে। শান্তনু কাউন্টারে গেল অর্ডার দিতে। জয়া লক্ষ করল, হঠাৎ টুকুনের চোখে খেলে গেল একটা দুষ্টুমীর হাসি। সে উঠে গিয়ে বাপির কানে-কানে কিছু বলে আবার ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল।

'কী বলেছ বাপিকে?' জিজ্ঞেস করল জয়া।

'ও এমনি একটা কথা!' খুব নিরীহভাবে জবাব দিল টুকুন।

জয়া আর কিছু ভাবেনি এই নিয়ে। একটু বাদে নিজের সামনে

মিষ্টির প্লেটের ওপর নজর পড়তেই তার কাছে রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল। শান্তনু ও টুকুনের প্লেটে অন্য মিষ্টির সঙ্গে একটা ক'রে রসকদম্ব, আর জয়ার প্লেটে তিনটা। সে অবাক হয়ে চোখ তুলতেই দেখল দু'জনের চোখে চাপা হাসি।

'মামণি, তুমি তো রসকদম্ব খুব ভালবাস! আমি শুনেছি বাপির কাছে! কলেজে পড়ার সময় রোজ খেতে।'

'হ্যাঁ, তা তো খেতাম।' হাসতে হাসতে বলল জয়া, 'আর তোমার বাপি? সে নিজে কী খেত—সেটা বুঝি বলেনি?'

'না, বলেনি। মামণি, বল না শুনি—আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।' কৌতূহল ঝিকমিকিয়ে ওঠে টুকুনের দৃষ্টিতে।

'ঘুগনী। এত-এত ঘুগনী খেত তোমার বাপি—রাক্ষসের মত। একবার তো পঁচা ঘুগনী খেয়ে যা হয়েছিল না—'হাসি চাপতে চেষ্টা করে জয়া।

'কী হয়েছিল? বল না শুনি—' ধৈর্য সইছে না টুকুনের।

'পেট খারাপ!'

টুকুন হেসে ভেঙ্গে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, 'বাপি! তুমি এত পেটুক ছিলে?'

স্মৃতির এক টুকরো হালকা মেঘ জয়ার মনটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরপর তিনদিন শান্তনু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি। কোন খবর নেই তার। জয়া ঠিক বুঝতে পেরেছিল, কিছু একটা ঘটেছে। নইলে এ কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্ততঃ জয়াকে না জানিয়ে সে ছুটি নেবে না। তার ঠিকানা রথীন-এর জানা ছিল। তাকেই ধরল জয়া। দু'জনে গিয়ে হাজির হল সেখানে। তার অবস্থা তখন দস্তুরমত কাহিল।

'কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠাতে পারলে না!' অভিমান আর রাগে জয়ার কান্না পেয়ে গিয়েছিল।

শান্তনুর মুখে মৃদু হাসি। সে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল তোমরা আজ আসবে। ভালই তো হল।'

সব শুনে জয়া বলল, 'তুমি আর কখনো ঘুগণী খেতে পারবে না।'

'ঘুগণীর কী দোষ?' বলল শান্তনু, 'দোকানদার পঁচা ঘুগণী খাইয়েছে—দোষ তার। পঁচা রসকদম্ব খেলেও অসুখ হতে পারে। তার জন্য কি তুমি রসকদম্বকে দোষ দেবে?'

জয়া হেসে ফেলেছিল তার কথা শুনে। রুগ্ন শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন খুব মমতা হয়েছিল তার। সারাক্ষণ তার পাশে থাকবার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগেছিল মনের মধ্যে। ছিলও অনেকক্ষণ।

জয়া নিজের প্লেট থেকে অন্য তিনটা মিষ্টি শান্তনুর প্লেটে তুলে দিয়ে বলল, 'এত মিষ্টি আর এখন খেতে পারি না। তুমি খাও। আমি রসকদম্বগুলো খাচ্ছি।'

খেতে-খেতে এক সময় জয়া বলল, 'সব পেমেণ্ট তো তুমিই করছ। আমাকে কিছুই শেয়ার করতে দেবেনা নাকি?'

শান্তনু এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'বেশ তো, অন্য দিন করো। আজকের দিনে টুকুনকে সামনে রেখে ভাগাভাগির হিসেবটা আমরা মুলতুবী রাখতে পারিনে জয়া?' এ সম্পর্কে আর কিছু বলেনি জয়া।

সেদিন একটা চাইনীজ রেষ্টুরেণ্টে নৈশভোজ সেরে তারা যখন ট্যাক্সি করে দাদার বাড়িতে ফিরে এলো রাত তখন দশটা। জয়ার লক্ষ এড়ায়নি—যাবার সময় টুকুনের যে-উৎসাহ ছিল, ফেরার পথে তা যেন হঠাৎ কেমন করে চুপসে গেল। বাড়িতে পৌঁছার পর সে একটা কথাও বলেনি। সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

শান্তনু ছোট্দার সঙ্গে কথা বলছিল—হঠাৎ মা ঘরে ঢুকে

তাকে ও জয়াকে ইশারায় ডাকল। মা তাদের টুকুনের ঘরের সামনে এনে তার দিকে ইংগিতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জন্মদিনের উপহারগুলো বিছানার ওপর ছড়ানো। টুকুন একপাশে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শান্তনু ও জয়া স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিঃশব্দে সরে এলো। জয়া বুঝল, টুকুন বড় হচ্ছে। বাপ-মা'র বিচ্ছেদের জন্য আগের মত প্রকাশ্যে আর সে দুঃখ বা অভিমান প্রকাশ করবে না। নিজের দুঃখ নিঃশব্দে নিজের মধ্যে বহন করতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সবই স্মৃতি ! না, এক বছর আগেও জয়া ভাবত অতীতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক বুঝি শেষ হয়ে গেছে। তার সামনে ছিল নতুন জীবন, নতুন বাস্তবতা। তার সেই স্বেচ্ছাবৃত জীবনে আবার অশান্তির ছায়া পড়বে, একবারের জন্যও ভাবেনি সে। আজ তার মনে হয়, কোথায় যেন হিসেবে একটা বড় ভুল ঘটে গেছে। যা সে আগে টের পায়নি।

জয়া এতক্ষন খেয়াল করেনি। হঠাৎ তার নজরে পড়ে, শান্তনু যেন একটা শারিরীক কষ্ট চাপতে চেষ্টা করছে। তার চোখদু'টো লাল। সে বসেছিল—শুয়ে পড়ল। জয়া ব্যস্ত হয়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ? মাথার সেই ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে নাকি ?'

আর্তনাদের মত শান্তনুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—'হ্যাঁ। জয়া, রাজুর মাকে বল ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে।' রাজুর মা শুনেই ছুটে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে টুকুন ছুটে এলো। সে তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল এনে একটা শিশি থেকে দু'টো ট্যাবলেট বের করে শান্তনুর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বলল, 'বাপি, ট্যাবলেট খাও।' শান্তনু নিঃশব্দে জলের সঙ্গে ট্যাবলেট দু'টো খেয়ে এক পলকের জন্য সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল।

টুকুন নিজে থেকেই মাকে বলল, 'ওটা ব্যথার ট্যাবলেট।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার এলেন। মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে চলে গেলেন। তিনি কাউকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেসও করলেন না। সবই যেন তাঁর জানা। যাবার সময় শুধু টুকুনকে বললেন, 'তোমার বাপি এখন ঘুমুবেন।' জয়া নিঃশব্দে বসে রইল। তার তো কিছু করার নেই। এক সময় সে বলল, 'টুকুন, তোমার বাপির এই ব্যথাটা কি প্রায়ই ওঠে?'

'হ্যাঁ, মামণি।' টুকুন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'তখন ডাক্তারবাবু এসে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন।'

বলতে বলতে টুকুনের চোখে জল এসে যায়। জয়া মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভয় নেই টুকুন। ভেলোরে খুব বড় ডাক্তার আছেন—সেখানে গেলে তোমার বাপির অসুখ সেরে যাবে।' জয়ার আশ্বাসে ফল হয় উল্টো। টুকুন ফোঁপাতে শুরু করে।

জয়া তাকে কি সান্ত্বনা দেবে! তার নিজেরই যে কান্না পাচ্ছে! না, সে কাঁদবে না। নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখে জয়া।

টুকুন কান্না-ভাঙা গলায় বলে, 'ওরা কেন আমার বাপিকে মারল, মামণি? আমার বাপি তো খুব ভাল।'

অবুঝ মেয়ে! তাকে জয়া কেমন করে বোঝাবে যে, ব্যক্তিগত জীবনের ভাল আর রাজনীতির ভাল এক নয়! পার্টি হল সবকিছুর উপরে। তাই তো, পার্টি ভিন্ন হ'লে একজন আর একজনের চোখে শত্রু হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। অথচ কয়েক বছর আগেও এমন ছিল না। নানা দলের কর্মীরা এক জায়গায় বসে তর্কবিতর্কের ঝড় তুলেছে! এইজন্য কারুর গলা কাটা যায়নি বা মাথা ফাটেনি।

শান্তনুর ওপর আক্রমণের কারণটা জয়া জেনেছে। উগ্রপন্থী জেনেও তার একটি ছাত্রকে সে প্রায়ই রাত্রে নিজের বাড়িতে থাকতে দিত। সেটাই ছিল তার অপরাধ। অন্যপক্ষ তাকে নিষেধ করা

সত্ত্বেও সে গ্রাহ্য করেনি। অথচ আশ্চর্য! নীতির দিক থেকে সে ছিল উগ্রপন্থী রাজনীতির ঘোর বিরোধী। তা সত্ত্বেও মানবিক দায় সে এড়াতে পারেনি। তপনের স্মৃতি ভেসে এসেছিল জয়ার মনে। সে-ও তো একদিন চেষ্টা করেছিল তাকে বাঁচাতে—যদিও সম্ভব হয়নি।

'মামণি!' টুকুনের দৃষ্টি মা-এর মুখে।

'হ্যাঁ, মামণি, তুমি ঠিকই বলেছ', বলতে-বলতে জয়া মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, 'তোমার বাপি খুব ভাল। যারা তাকে মেরেছে, একদিন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ পাবে।'

১৪

জয়া কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল যে, সে তার সমাজ থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে? সমাজ বলতে তো তার পার্টি। পার্টির বাইরে এক সময়ের আত্মীয় বা বন্ধু যারা ছিল, তাদের অনেকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না বলা চলে। জয়াই সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। আত্মিক সম্পর্কহীন লৌকিকতা অর্থহীন মনে হয়েছিল তার। আজ ভাবতে অবাক লাগে জয়ার। এতদিন যাদের সে পরম আত্মীয় ভেবে এসেছে, আজ তাদের সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক নেই। পর হয়ে গেছে তা'রা। রাস্তায় দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যায়। কিম্বা চক্ষু-লজ্জা এড়াতে না পেরে কেউ হয়ত বড়জোর জিজ্ঞেস করবে—'জয়াদি, ভাল তো?' এর বেশি নয়। না, জয়া তাদের দোষ দেয় না। তাদের দিক থেকে তারা ঠিকই আছে। সে নিজেও একদা তাদের মতই ভাবত—পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারের

ক্ষেত্রে একই মাপকাঠি তো সেও ব্যবহার করেছে সেদিন। নইলে শান্তনুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি এত তিক্ত হয়ে উঠত? আদর্শগত ঐক্য ছিল না বলেই না সেটা হতে পেরেছিল। আর পার্থ? তাকে নিয়েও কি একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে তার জীবনে? না, জয়ার নিজের দিক থেকে নয়। তার ভাবনার জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। পার্থর সঙ্গে পথের ও মতের অমিল সত্ত্বেও তাকে সে শত্রু ভাবেনি। বরং পার্থই তাকে ভুল বুঝেছে। রাগ করে বাড়ি আসা একরকম ছেড়ে দিয়েছে। সবই বুঝতে পারে জয়া। দুঃখ লাগে। পার্থ বড় অবুঝ আর অসহিষ্ণু। সে যেন ধরেই নিয়েছে, পার্টির সঙ্গে জয়ার মতবিরোধের ব্যাপারটা একটা অজুহাত—আসলে এটা তার শান্তনুকে ফিরে পাওয়ার কৌশল! এত স্থূলবুদ্ধি পার্থর! এতদিনেও সে চিনতে পারল না তাকে? এ যে তার ব্যক্তিত্বের অপমান—একবারও মনে পড়ল না? আসলে ঈর্ষা। শান্তনু সম্পর্কে বরাবরই তার দারুণ ঈর্ষা। জয়ার কিন্তু প্রথমদিকে খুব খারাপ লাগত না। এটাকে তার প্রতি পার্থর গভীর ভালবাসার লক্ষণ ভেবে মনে-মনে সুখ অনুভব করেছে সে। কিন্তু আজকাল সেই ব্যাপারটাই তার কাছে অসহ্য ঠেকছে। আর পার্থ সেটা বুঝতে পেরেই কি দূরে-সরে গেছে? কখনো-কখনো হঠাৎ গভীর রাত্রে এসে হাজির হয়। নিতান্ত মামুলি দু'চারটে কথা বিনিময় শুধু। আন্তরিকতার লেশমাত্র স্পর্শ থাকে না তার মধ্যে।

এই তো সেদিন তাকে পরীক্ষা করার জন্যই জয়া বলেছিল, 'তুমিও থাকছ না। চারদিকের যা অবস্থা, ভাবছি বাড়িটা ভাড়া দিয়ে হস্টেলে গিয়ে থাকব। আপত্তি আছে তোমার?'

'আপত্তি? মোটেই না।' জবাবটা পার্থর জিভের ডগায় যেন তৈরি ছিল।

কলেজ থেকে ফিরে পাখার তলায় বসে বিশ্রাম নিতে-নিতে

জয়া ভাবছিল। কলেজে থাকলে তবুও ভাল লাগে। সময়টা এক রকম করে কেটে যায়। কিন্তু বাড়ি ফিরেই একটা ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। সময়ের মন্থর গতি অসহ্য লাগে। টুকুন আছে বলে রক্ষা। রোজ বিকেলে জয়া চলে যায় মেয়ের কাছে। ইস্কুল থেকে ফিরে মাকে দেখে তার কী আনন্দ! জয়ার কাছে ভারী অদ্ভুত লাগে তার এই মা হওয়ার ব্যাপারটা। মনে আছে। কী ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে! তার আশঙ্কা ছিল, মা হলে তার সব স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে। সংসারের গতানুগতিকতার চক্রে আরো দশটা মেয়ের মত তাকে বাঁধা পড়ে যেতে হবে। তার ভয়টা যে একেবারে অমূলক ছিল, তা নয়। অনেক মেয়ে কমরেডকে সে দেখেছে। ইচ্ছা থাকলেও তারা কিছু করতে পারে না। কিন্তু জয়া তা চায়নি। তাই তাকে মুক্তির পথ খুঁজতে হল। সে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু শান্তনুই তাকে যেতে দেয়নি। ভালই করেছিল সে বাধা দিয়ে। নইলে টুকুনের অস্তিত্ব আজ কোথায় থাকত? ভাবতেও খারাপ লাগে। সেদিন থেকেই একটা অপরাধবোধ তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। মনে হলেই পীড়া অনুভব করে জয়া।

কাজল এসে বলে, 'দিদিমণি, আপনার একটা চিঠি আছে।' বিছানার তলা থেকে বের করে সে চিঠিটা জয়ার হাতে দেয়।

রথীনের চিঠি। খামের ওপর হাতের লেখা দেখেই জয়া বুঝতে পারে। খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে। তারপর দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দিনের হিসেব করে। শান্তনুর ফিরে আসতে আরো এগারো দিন বাকি।

দেড়মাস হয়ে গেল, রথীন শান্তনুকে নিয়ে ভেলোরে গেছে। তাদের যাবার দিনে জয়াও ষ্টেশনে গিয়েছিল তাদের তুলে দিতে। শান্তনু সারাক্ষণ গম্ভীর। জয়া ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে সে ভয় পেয়ে গেছে খুব।

'তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?' বলল জয়া।

'ভয়!' আরো বেশি নারভাস দেখাল শান্তনুকে। সে কয়েক মুহূর্ত জয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ভয় নয়, জয়া। টুকুনের কথা ভেবে মনটা খারাপ লাগে। মেয়েটা বড্ড ইমোশনাল।'

'তা ছাড়া আর কী হবে? তোমার মেয়ে তো!'

'আমি খুব ইমোশনাল নই।'

'তা বৈকি! তোমাকে যেন আমি চিনি না!'

দু'জনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল।

জয়া বলল, 'মেয়ের জন্য ভেবো না। তুমি আগে সুস্থ হয়ে ফিরে এসো—সেটা সবার আগে দরকার। তারপর মেয়ের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।'

শান্তনু বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার চোখে।

জয়া আবার বলল, 'তুমি ফিরে এলে টুকুন তোমার কাছেই থাকবে। সে বড় হয়েছে—তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে। এখন সে মামার বাড়িতে থাকতে সঙ্কোচ বোধ করে।'

শান্তনুর মুখে খুশির আভাস। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। এক সময় সে বলল, 'জয়া, রথীন সব জানে। তোমাকেও বলে রাখছি। যদি আমি আর ফিরে না আসি—বলা তো যায় না—'

'কক্ষনো না। এ হ'তে পারে না।' শান্তনুকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল জয়া, 'প্লীজ শান্তনু, এ-ভাবে বলো না। ফিরে তোমাকে আসতেই হবে।'

জয়ার কথায় হঠাৎ যেন শান্তনু পলকের জন্য স্থির হয়ে গিয়ে আবার নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলল। একটু হেসে বলল, 'তুমিই না আমাকে ইমোশনাল বলেছিলে এইমাত্র!'

হঠাৎ ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছিল জয়া। সে শান্তনুর কথায় একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। সেটাকে ঢাকবার জন্য সে বলল, 'তাই বলে আজেবাজে কথা শুনতে কারুর ভাল লাগে ?'

শান্তনু জবাবে বলল, 'আজে-বাজে নয়, জয়া। ঘটে যেতে পারে। নিজের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি তো। যাই হোক—শোন। আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, এল-আই-সি আর ব্যাঙ্কে যা থাকবে—সব টুকুনের। আমি কাগজপত্র ঠিক করে রেখেছি।'

জয়া মাথা নিচু করে উদ্গত চোখের জল গোপন করেছিল। বুঝতে দেয় নি তাকে। কিছুক্ষণ বাদে সে মুখ তুলে তার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, 'শান্তনু, তোমার সঙ্গে আমার যাই ঘটে থাক, যদি ফিরে না আস, সেটা হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ।'

শান্তনুর দৃষ্টি উদাস। অন্যমনস্কভাবে সে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। জয়ার ইচ্ছে হয়েছিল তার সেই মুহূর্তের ভাবনাগুলোকে জানতে। কিন্তু তার উপায় ছিল না। সে কিছুই বলবে না।

সেদিন স্টেশনে আসার আগে বাড়িতে রথীনকে আলাদাভাবে ডেকে জয়া বলেছিল, 'রথীন, ও যেন জানতে না পারে। এই তিন হাজার টাকা তোমার কাছে রেখে দাও।' রথীন অবাক হয় নি। একমাত্র সে-ই তাকে বোঝে। তথাপি সে-ও আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, 'থাক না। যা আছে তাতেই বোধ হয় হয়ে যাবে।' জয়া শোনেনি তার কথা। জোর করে তার হাতে টাকাটা তুলে দিয়ে সে বলেছিল, 'রথীন, শান্তনুকে সুস্থ করে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তোমার। যত টাকা লাগুক—তার চিকিৎসা যেন অসম্পূর্ণ না থাকে।'

জয়া ও শান্তনু নিঃশব্দে বসেছিল ট্রেনের মধ্যে। এক সময় রথীন কম্পার্টমেন্টে ঢুকে তাড়া লাগাল, 'জয়া, শিগ্‌গির নেমে যাও। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে।'

এতক্ষণে শান্তনুর সম্বিত ফিরে এলো। সে জয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মুখে কিছু বলল না। জয়া বলল, 'আসি।' আর কিছু বলা সম্ভব হল না তার পক্ষেও। সেই মুহূর্তে তার সব কথা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। একটা বোবা যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে বাইরের দিকে জানালার সামনে এসে সে দাঁড়াল। শান্তনু তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সে হঠাৎ সিট ছেড়ে উঠে এলো জানালার সামনে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে সে বলল, 'জয়া, আগেও বলেছি, আবার বলছি—তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমরা যা করেছিলাম, তা আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাসের জন্যই করেছিলাম। আমাদের সামনে হয়ত অন্য উপায় ছিল না।'

'ছিল বৈকি, শান্তনু—কিন্তু আমি যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তুমিও। তাই অন্য উপায় আমাদের নজরে পড়েনি।' জয়ার কথায় শান্তনু কি কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল ? সে কোন জবাব না দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। জয়া বলে চলল, 'সেদিনের ভুলের জন্য তুমি ক্ষমা করলেও আমি তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না !'

আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে এলো জয়ার কণ্ঠ। সে হাত বাড়িয়ে শান্তনুর একটা হাত স্পর্শ করল।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। শান্তনু ব্যস্তভাবে বলল 'জয়া, সরে দাঁড়াও। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।'

জয়া শান্তনুর হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। চলন্ত ট্রেনের জানালায় তার মুখটা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু জয়ার মনের পর্দায় সেই মুখ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এতদিন যা ছিল আবছা, আজ তা-ই দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। নতুন করে সে অনুভব করল—শান্তনুর প্রতি তার সেই ভালবাসা আবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর রাগ হতে লাগল তার। পার্থকে সে কেমন করে মুখ দেখাবে? চিরকালের মত সে ছোট হয়ে গেল তার কাছে। পার্থ যদি এখন তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তবু তার বলার কিছু থাকবে না। শেষ পর্যন্ত তার সন্দেহই তো সত্যে পরিণত হল। নিজের এই অস্থিরমতিত্বের জন্য লজ্জা বোধ করতে লাগল জয়া।

আসলে সে ভুল করেছিল গোড়াতেই। তার উচিত হয়নি অমন তাড়াহুড়ো করে পার্থকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা। মনটাকে আরো ভাল করে জানার জন্য ধৈর্য ধরা উচিত ছিল তার। কেন সে তা পারল না? সেদিন তো একবারও এ-সব প্রশ্ন তার মনে জাগে নি! জয়ার মনে পড়ে। শান্তনু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর বাইরের দিক থেকে তার কোন অসুবিধে ছিল না। কমরেডরা সব সময় তাকে সাহায্য করেছে। তবুও সে ছিল একা। এই একাকীত্ব রাত্রির অন্ধকারে তাকে পাগল করে তুলত। বিশেষ করে টুকুন যখন তার বাপির জন্য কাঁদত, তখন শান্তনুর বিরুদ্ধে তার মন রাগে ফুঁসিয়ে উঠত। ঘৃণা ও বিদ্বেষ অন্ধ করে ফেলেছিল তাকে। শান্তনুর সমস্ত স্মৃতি জীবন থেকে মুছে ফেলাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। তাছাড়া আরো একটা সত্য কি অস্বীকার করতে পারে জয়া? ভাবতেও লজ্জা লাগে আজ। পার্থর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগে নিজের অজ্ঞাতে তার দেহের মধ্যে যে একটা রাক্ষুসে ক্ষুধা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিচারবুদ্ধি লোপ করে দেবে—কে জানত? তারপর আর কিছু ভাবতে পারেনি সে। সুযোগ ছিল না অত তলিয়ে দেখার। প্রবহমান স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেটাকেই সেদিন বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়েছিল সে। উন্মাদনার ঘোরে মনে হয়েছিল শান্তনুর প্রতি তার ভালবাসা শেষ হয়ে গেছে। অথচ আজ বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হল, জীবনের সেই প্রথম

ভালবাসা মরে যায় নি—হৃদয়ের এক কোণে লুকিয়ে ছিল শুধু!

স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে সারারাত ধরে জয়া ভাবল। না, পার্থকে সে ঠকাবে না। তার তো কোন দোষ নেই। তাকে সে সব খুলে বলবে। তারপর যা ইচ্ছে, সে করুক। যদি সে মুক্তি চায়, জয়া বাধা দেবে না। পার্থর যতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটা শোধরাবার শক্তি তার নেই। কিন্তু নতুন করে তার আরো ক্ষতি হোক—সেটা সে চায় নি।

কাজল ঘরে ঢুকে তাগিদ দেয়—'চান করবেন না দিদিমণি? অনেক বেলা হল যে।' তাই তো! তার জন্য কাজলও না খেয়ে রয়েছে।

'তোকে কতদিন বলেছি—আমার জন্য অপেক্ষা না ক'রে খেয়ে নিবি।'

'আমার খিদে পায়নি।' বলতে বলতে কাজল হাসে।

'এত বেলা পর্যন্ত খিদে পায় নি, বললেই হল? আর কক্ষনো এমন করবি না। তা হ'লে আমি খুব রাগ করবো।' জয়ার সস্নেহ তিরস্কারে মেয়েটা হাসতে থাকে।

জয়া ওঠে পড়ে। চিঠিখানা ভাঁজ করে খামের মধ্যে পোরে। এতদিনে রথীন সব খুলে লিখেছে। যদিও জয়ার মনে এই ধরণের আশঙ্কাই ছিল। শান্তনুর মস্তিষ্কের যে একটা জটিল অপারেশনের দরকার হয়েছে—সেটা রথীন তার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করে গেছে আগেকার চিঠিগুলোর মধ্যে। কারণটা অবিশ্যি অনুমান করা শক্ত নয়। তবুও এ তার ভারী অন্যায়। জয়া তাকে বারবার করে বলে দিয়েছিল, অপারেশন হলে তাকে যেন জানানো হয়। সে অবশ্যই যাবে। কিন্তু ইচ্ছে করেই রথীন সমস্ত খবর তার কাছে চেপে গিয়ে শুধু লিখেছিল—শান্তনু ভাল আছে। অপারেশন লাগবে না।

এগারোটা দিন আর কাটতে চায় না। কলেজ থেকে ফিরে জয়া রোজ ক্যালেণ্ডার দেখে। প্রতিটি মুহূর্তকে কত দীর্ঘ মনে হয়। সময়ের শম্বুক গতি বোধ হয় একেই বলে। অথচ একদা সময় কত দ্রুত ছিল তাদের জীবনে! মনে আছে সেবার মুশৌরিতে বেড়াতে যাবার কথা! কেমন করে যে দিনগুলো কেটে গিয়েছিল, টের পায়নি তারা। ফেরার সময় শান্তনু বলেছিল, 'এর মধ্যে কুড়িটা দিন কেটে গেল? মনে হচ্ছে যেন কাল এসেছি!' তারা ঠিক করেছিল, প্রতি বছর এমনি করে একবার বাইরে বেড়াতে যাবে। কিন্তু একবারের বেশি আর যাওয়া হয়ে উঠল না। শুরু হয়ে গেল পার্টির মধ্যে ভাঙন। ভাঙনের সুর বেজে উঠল তাদের জীবনেও। সেই তেষট্টি সালে।

কলেজ কামাই করে জয়া স্টেশনে গেল শান্তনুকে রিসিভ করতে। টুকুনও ছিল তার সঙ্গে। ট্রেনটা ইন্ করার একটু বাদেই একটা কামরার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল—'বাপি! বাপি!' জয়াও লক্ষ করেছে শান্তনু ও রথীনকে। মেয়ের হাত ধরে তাদের দিকে দ্রুত পায়ে এগোল সে।

গাড়ি থেকে নেমেই মেয়েকে কাছে টেনে নিল শান্তনু।

'কেমন আছ, মামণি?'

'ভাল। তুমি ভাল হয়ে গেছ, বাপি?'

'হ্যাঁগো—মামণি!'

জয়া নিঃশব্দে দেখছিল শান্তনুকে। মাথায় একটা টুপি পড়েছে। বোধ হয় অপারেশনের জন্য মাথা ন্যাড়া করতে হয়েছিল। এবার সে জয়ার দিকে তাকায়। হ্যাঁ, তাকে সম্পূর্ণ সুস্থই বোধ হচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে সেই ঘোলাটে ভাবটা আর নেই। তার স্বাভাবিক সজীবতা ফিরে এসেছে। শুধু ট্রেন-ভ্রমণের একটুখানি ক্লান্তি লেগে রয়েছে চোখে-মুখে।

'তোমার শরীর তো সারেনি দেখছি!' শান্তনু বলল জয়াকে।

'ও কিছু না।' জয়া উড়িয়ে দেয় তার কথাটা।

'তা বললে হবে কেন? বেশ বুঝতে পারছি, তুমি শরীরের প্রতি একেবারে যত্ন নিচ্ছ না। আমাকে খুব তাড়া লাগিয়ে ভেলোরে পাঠিয়েছিলে! কিন্তু নিজের ব্যাপারে এত ঔদাসীন্য কেন?'

জয়ার বুকের মধ্যে ভাল লাগার শিহরণ। মুহূর্তের একটা আবেগ। নিজেকে সামলে নিয়ে সে হেসে বলে, 'এখন আমার শরীরের কথা থাক। আগে বাড়ি চল।'

রথীন কুলির মাথায় জিনিসপত্র তুলে দিয়ে তৈরি। সে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও' সব সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপারগুলো বাড়িতে ফিরেও সারা যাবে।' তার কথায় সবাই হেসে উঠল।

বাড়ি ফিরে রথীন এক সময় জয়াকে আড়ালে ডেকে বলল, 'তোমার টাকার সামান্যই ফিরে এসেছে। টাকাটা দিয়ে ভালই করেছিলে। নইলে মুশকিলে পড়তে হত।'

জয়া বলল, 'আমি ঠিক জানতাম—লাগবে। তুমিই নিতে চাওনি। এখন দেখলে তো?'

রথীন হাসে, 'এই জন্যই বোধ হয় পণ্ডিত ব্যক্তিরা মেয়েদের বৈষয়িক বুদ্ধির প্রশংসা করে গেছেন।'

'যাক—বুঝতে পেরেছ তা হলে।' জয়া জবাব দেয়, 'ভবিষ্যতে দরকার হলে আমার পরামর্শ নিয়ো। তোমাকে পরামর্শ দেবার তো কেউ নেই!'

'আমার জন্য করুণা হচ্ছে তোমার!'

দু'জনই হেসে ফেলে। আজ সবারই খুব হালকা মুড। একটা দারুণ দুশ্চিন্তা কেটে গেছে। ভেতরে ভেতরে জয়ার কম ভয়

ছিল না। আর রথীন? এই ক'মাস সে যা করেছে, সেটা বন্ধুত্বের একটা নিদর্শন হয়ে রইল। সে তো শুধু শান্তনুর বন্ধু নয়—তারও বন্ধু। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো থেকে। বিগত এক দশকের রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটার মধ্যেও কেমন করে তাদের সেই বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে—সেটাকে রহস্যের মত মনে হয় জয়ার। অথচ শান্তনু ও তার সম্পর্ক সেই ঝড়ের ঝাপটা সইতে পারল না—ভেঙ্গে গেল। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যে-সহনশীলতা সীমাহীন, স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তারই এত অভাব দেখা দেয় কেন? পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বন্ধুত্ব চলে, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে তা অচল—সেটাই কি তার কারণ? একজনের ওপর আর একজনের অধিকার হওয়া চাই নিরঙ্কুশ—শরীর আর মন দু'টোকেই কেন্দ্র করে, যার গালভরা নাম একাত্মতা! কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে একজন তার স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়ে আর একজনের সঙ্গে একাত্ম হবে—এ-ও কি সম্ভব! শান্তনুর সঙ্গে জয়ার তো শুধু আদর্শের বিরোধ দেখা দেয়নি—দেখা দিয়েছিল ব্যক্তিত্বেরও সংঘাত। বরং সেটাই শেষে প্রধান হয়ে উঠেছিল।

টুকুনের জিনিসপত্র সব এ বাড়িতে চলে এসেছে দেখে শান্তনু তো অবাক! বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বোধহয় ভেবেছিল, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই সেদিন মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিল জয়া। আগেকার ঘটনা মনে করলে ভাবা অস্বাভাবিক নয় তার পক্ষে। প্রায় তিন বছর সে টুকুনকে দেখতে পায় নি।

'জয়া, টুকুনকে অন্যের বাড়িতে থাকতে দেখে আমি কষ্ট পাই ঠিকই। কিন্তু তবু তোমার কাণ্ড দেখে আমার ভয় হচ্ছে।'

'কেন?'

'আমি কি পারব ওর দায়িত্ব বহন করতে?'

'পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে।' জয়া একটু ইতস্তত:

করে বলল আবার, 'ওখানে টুকুন থাকতে চায় না আর। আমার অসুবিধের কথা তুমি জান। আমার ওখানে সে কিছুতেই থাকবে না।'

টুকুন কিন্তু খুব খুশী। এতদিনে সে যেন নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। তার হাবভাব চালচলনে সেই অধিকারবোধ সুস্পষ্ট। এটাই বোধহয় মানুষের বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড়র প্রভেদ নেই। এই অধিকারবোধ না থাকলে—প্রিয়জনের ওপর নিজের অধিকার খাটাতে না পারলে মানুষ নিঃসঙ্গ বোধ করে। টুকুনের মত বালিকাও তা বোঝে। নইলে মামার বাড়িতে তার তো কোন অসুবিধে ছিল না। যথেষ্ট আদর যত্নের মধ্যেই তার দিন কেটেছে। তবু তার মধ্যে একটা অভাববোধ ছিল বৈকি! একদিন তো সে বলেই ফেলল।

'মামণি, আমার এখানে থাকতে ভাল লাগে না।'

'কেন? কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?'

'না।'

'ছোট মামী?'

'বলেছি তো—না।'

'তবে কী অসুবিধে হচ্ছে তোমার? কেন ভাল লাগে না?'

চুপ করে ছিল টুকুন। পীড়াপীড়ি করতে সে বলে ফেলল, 'পরের বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে?'

পরের বাড়ি! মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়েছিল জয়া। তাকে ধমক দিয়ে সে বলেছিল, 'ছিঃ টুকুন, অমন করে বলতে আছে? দিদা, মামা, মামী সবাই তোমাকে কত ভালবাসেন! তাঁরা শুনলে কী ভাববেন?'

'আমি কি তাদের বলব! তবু আমার ভাল লাগে না।'

'তবে আমার কাছে এসে থাকবে?' জবাবের জন্য মেয়ের মুখের দিকে তাকাল জয়া। তার চোখেমুখে লজ্জার আভাস।

করেছে। আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে সে-যে তার সঙ্গে আর থাকতে পারে না—এটা ভাবা উচিত ছিল তার।

হঠাৎ জয়া কেমন একা হয়ে গেল। ইদানীং পার্থ বাড়িতে থাকত না, তবু সে-যে এই সংসারের একজন—এই ভাবনাটুকুই অনেকখানি ভরসা যোগাত তাকে। জয়ার সাহসের অভাব নেই, তথাপি সংসারে একজন পুরুষের অস্তিত্ব না থাকলে কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব থেকেই যায়। জয়ার মত সাহসী মেয়েও তার ব্যতিক্রম নয়। আসলে এই সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তার একান্ত অভাব।

শান্তনুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এমনি নিঃসঙ্গতার মধ্যেই একদা তার পাশে পার্থ এসে দাঁড়িয়েছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে জয়ার। সেদিন পার্টির ভেতরের এবং বাইরের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করেই সে তাকে বরণ করে নিয়েছিল। আদর্শ ও কর্মজীবন তাদের নিবিড়ভাবে বেঁধে রেখেছিল। একমুহূর্তের জন্য তারা অসুখী বোধ করেনি। বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি কম ছিল? কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করেনি তারা। এমন কি টুকুনের কষ্টও উপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। তার মধে ছিল একটা নেশার ঘোর। তার মাতৃসত্তার চেয়ে নারীসত্তাটাই বড় হয়ে উঠেছিল সেদিন। উন্মাদনার ঘোর কেটে গেলে সেটা বুঝতে পেরেছিল জয়া। তবুও সে অসুখী ছিল না। পার্থকে সুখী করে নিজেও সুখী হতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে। কিন্তু জয়ার জীবনে সুখ বড় অস্থায়ী। শান্তনু গেল। পার্থকেও যেতে হল। ভাবতে ভারী খারাপ লাগে। আবার তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা রকম টীকা-টিপ্পনি। অবিশ্যি সবই তার আড়ালে। তবু জয়ার কানে আসে বৈকি! বিশেষ করে, কলেজে যারা এতদিন তার অ্যান্টি-গ্রুপে ছিল, তারা এর সুযোগ নিতে ছাড়বে কেন? ছাত্রীদের মধ্যেও খবরটা রটিয়েছে তারা। তার ইমেজ নষ্ট করে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

সেদিন ক্লাশে ঢুকতেই ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে নজর গেল জয়ার।

মুহূর্তের মধ্যে সব রক্ত গিয়ে মাথায় উঠল। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে সে লেখাটা পড়ল—"বারবার বিবাহ আর ডিভোর্স কি ভারতীয় নারীর পক্ষে ইয়াংকি সভ্যতার বিকৃত অনুকরণ নহে? এই ধরণের আচরণ দ্বারা আমাদের আদর্শ পরিবার-জীবনের মহৎ ঐতিহ্যকে কি কলঙ্কিত করা হয় না?"

'বাঃ—খুব সুন্দর তো প্রশ্নটা!' বলতে-বলতে জয়া ছাত্রীদের দিকে হাসিমুখে তাকায়, 'মনে হচ্ছে, এব্যাপারে কিছু আলোচনা হোক—তোমরা চাও। অ্যাম আই রাইট?'

ক্লাশে গুঞ্জন উঠল। শান্তা দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

জয়া মৃদু হেসে বলল, 'বেশ। তার আগে আমাদের পরিবার-জীবনের মহৎ ঐতিহ্য সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্ন তোমাদের সামনে রাখব। স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্বেও পুরুষরা ইচ্ছে করলে আরো দু'তিনবার বিয়ে করতে পারত। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। স্বামীর একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে তারা সংসার করতে বাধ্য হত। এখন বল, তোমরা সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাও কিনা। শান্তা, তোমার কী মত?'

ছাত্রীদের সরব গুঞ্জনে ক্লাশ মুখরিত। একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'শান্তা জবাব দে এবার।' শান্তা চুপ করে বসে রইল। কৃষ্ণা বলল, 'বাপরে! সতীন নিয়ে ঘর! ভাবতেও ঘেন্না লাগে।'

জয়া হাসতে হাসতে বলল, 'তা হলে বুঝতে পারছ—ঐতিহ্য চিরস্থায়ী কিছু নয়। যা ভাল লাগে না—মানুষ তা বর্জন করে। যুগের প্রয়োজনে অনেক কিছু পাল্টে যায়। যেমন সম্পত্তির ওপর অধিকার। পিতার সম্পত্তির ওপর এতকাল শুধু ছেলেদের অধিকার ছিল—এখনও কার্যতঃ তাই আছে। এটাকে তোমরা পরিবার জীবনের মহৎ ঐতিহ্য বলে মেনে নিতে চাও?' কথাটা বলে জয়া শান্তার দিকেই তাকায়। এবারেও তার দিক থেকে কোন জবাব নেই।

পার্থর কথা ভেবেই এই যন্ত্রণা। জয়া ভেবে পাচ্ছিল না কেমন করে কথাটা তাকে বলা যাবে। অথচ না বলে উপায় নেই। সচেতনভাবে সে তাকে প্রতারণা করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত জয়াই খবর পাঠিয়েছিল তাকে। তার কাছে খবরটা পৌঁছুতে বোধ হয় একটু সময় নিয়েছিল। কয়েকদিন বাদে গভীর রাত্রে সে এসে হাজির হল। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। সারামুখে দাড়ি। চোখ দু'টোর দৃষ্টি তীব্র। জয়ার দিকে একনজর দেখে নিয়ে সে বলল, 'আসতে খবর পাঠিয়েছিলে কেন?'

'কিছু বলার আছে তোমাকে। তার আগে চা খেয়ে নাও।' বলল জয়া।

চা-এর ব্যাপারে পার্থর অরুচি নেই। জয়া কাজলকে না ডেকে নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে চা বানাল। ইতিমধ্যে সে ভেবে নিল কথাটা কেমন করে তাকে বলবে। মনে মনে আবৃত্তি করল একবার। সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল সে। কী দরকার বলার? তাতে কি কারুর লাভ হবে? ভালবাসা নিক্তিতে ওজন করে ক'জন স্বামী-স্ত্রীর জীবন চলে? একটু কম-বেশিতে কিছু এসে যায় না। পার্থ আর জয়ারও আটকাবে না।

তবু শেষ পর্যন্ত না বলে পারল না জয়া।

পার্থ নিঃশব্দে শুনল, শেষে মন্তব্য করল—'যাক, এতদিনে স্বীকার করলে!' বিদ্রূপের তিক্ত হাসি তার মুখে।

'এতদিন আমি বুঝতে পারিনি।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম প্রথম থেকেই।'

'হয়ত তোমার বোঝার ক্ষমতা বেশি! তাই পেরেছিলে।'

জয়া আরও তিক্ত কথা বলতে পারত, কিন্তু বলল না। ইচ্ছে হল না পার্থকে আঘাত দিতে। বরং তার জন্য কেমন একপ্রকার কষ্ট জাগল বুকের মধ্যে। সত্যি, ব্যাপারটা বড় বিশ্রী। জয়া ভাবতে

পারেনি এতবড় একটা ভুল তার জীবনে ঘটে যাবে। পার্থর প্রতি তার ভালবাসায় ফাঁকি ছিল বলে মনে হয়নি সেদিন। অথচ আজ সেটা ফাঁকি বলেই ধরা পড়ল। মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালের শয্যায় শায়িত শান্তনুর দু'টি চোখের দৃষ্টি জয়ার জগৎটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল। সেটাকে সাময়িক ভাবাবেগ বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হল তাকে।

হঠাৎ খুব গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল পার্থ।

'এ-কি! চললে নাকি?' জয়ার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

'হ্যাঁ।' সরাসরি জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল পার্থ, 'এখন আমাদের নিজের-নিজের পথ ধরে চলাই ভাল।'

জয়া হঠাৎ যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল—কী জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে জানে, পার্থ যা ভাবে তাই করে। ভীষণ একগুঁয়ে।

পার্থ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। জয়া বোবার মত দাঁড়িয়ে রইল। একবার ইচ্ছে হল তাকে ডাকে, কিন্তু পারল না। এক সময় তার হুঁশ হল। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম নেই চোখে। আশ্চর্য! পার্থও সরে গেল তার জীবন থেকে। জয়া কি তাই চেয়েছিল? নিজের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। না, সে তা চায়নি। শান্তনুর প্রতি তার ভালবাসা সত্বেও সে চায়নি পার্থ সরে যাক। তার জন্য এখনও জয়ার বুকের মধ্যে রয়েছে একটা কোমল অনুভূতি—তার কী নাম, জানা নেই। হয়ত সেটা প্রেম নয়, তবু সহানুভূতি-মায়া-মমতা সব মিলিয়ে সেটা তার চেয়ে কমও নয়। অন্ততঃ একসঙ্গে জীবন যাপনের পক্ষে সেগুলোকে তুচ্ছ করে ফেলে দেওয়া যায় না।

দিন কয়েক বাদে একজন কমরেড এসে পার্থর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেল। না, পার্থর ওপর রাগ করতে পারেনি জয়া। সে ঠিকই

সঙ্গে সঙ্গে টুকুন জবাব দিল না। একটু ভেবে বলল, 'না, আমি এখানেই থাকব।' বলে সে মুখ নিচু করে ফেলল।

জয়া জানত, টুকুন যাবে না। মা-এর ওপর দারুণ অভিমান তার। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। তার বাপি ছাড়া অন্য একজন পুরুষ মামণির ওপর অধিকার খাটাচ্ছে—সেটা সে প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেনি। কী দারুণ ঈর্ষা মেয়ের! মাঝে মাঝে জয়ার খুব রাগ হত। এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের ডেঁপোমি। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকালে সব রাগ জল হয়ে যায়। দু'চোখে কী সরল অসহায় দৃষ্টি! তার কী দোষ? বাবা-মাকে একান্ত করে পাওয়ার অধিকার তার ছিল বৈকি! একটি শিশুর কাছে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? সেই আনন্দ থেকে তারা তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

রাজুর মা চা নিয়ে এল।

চা খেতে-খেতে রথীন বলল, 'এই দু'মাস রসম আর সম্বরম খেয়ে-খেয়ে জিভের আর হাল নেই। এখন কিছু দিন মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে জিভটাকে সেট করতে হবে।'

তার কথা শুনে টুকুন হেসে কুটিকুটি। বলে, 'ও কাকু, রসম আর সম্বরম কী গো?'

'ওরা ওই খায়। তোমাকে আর তোমার মামণিকে একদিন এখানকার মাদ্রাজী রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব।' বলল রথীন।

ব্যস—আর কথা নেই। টুকুন পেয়ে বসে রথীনকে। কবে যাবে তক্ষুণি বলা চাই।

'রসম-সম্বরম খেতে আমার দারুণ লোভ হচ্ছে!' বলে টুকুন।

'তা হ'লে তো আর দেরি করা যায় না। কালই তোমাদের নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে একটা মাদ্রাজী রেষ্টুরেণ্টে। দেখবে কী জিনিস!'

রথীনের বলার ধরনে শান্তনু ও জয়া হেসে ফেলে।

এক সময় জয়া উঠল বাড়ি ফিরবে বলে। রাজুর মা ছুটে এল।

'এ-কি দিদিমণি! খেয়ে যাবে না? আমি তোমার জন্য চাল নিয়েছি।'

টুকুন মাকে জড়িয়ে ধরল, 'না মামণি, তুমি যেতে পারবে না। আজ সারাদিন তুমি থাকবে—কিছুতেই ছাড়ব না।'

রথীন হাসতে হাসতে বলল, 'যেতে নাহি দিব।'

শান্তনু নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার মুখে মৃদু হাসি।

১৫

পার্থর সন্দেহপ্রবণতা দেখে জয়া কতদিন তার ওপর রাগ করেছে। তার মনে হতো শান্তনু সম্পর্কে সে অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠছে। তার ধারণাটা একেবারে মিথ্যে ছিল না। তবু জয়ার আজ আর কোন রাগ নেই তার ওপর। বরং তাকে প্রশংসাই করতে হয়। সে মনের মধ্যে কিছু চেপে রাখে না। তাকে বোঝা যায়। শান্তনুর মত অস্পষ্ট নয় সে—মনের কথা অপ্রিয় হলেও সোজা একজনের মুখের ওপর বলে দিতে তার বাধে না। সে যে বরাবর বলে এসেছে—অযথা সেন্টিমেন্টাল হয়ে লাভ নেই, সেটা সে নিজের জীবনে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে।

সেদিন শান্তনুকে মাদ্রাজ-মেলে উঠিয়ে দিয়ে আসার পর থেকেই জয়ার মনের ভেতরে একটা যন্ত্রণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

রুবী উঠে দাঁড়াল।

'তুমি কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল জয়া।

রুবী বলল, 'জানেন দিদি, আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার বড়দি বাবার সম্পত্তির ওপর তার অংশ দাবী করেছিল। শুনেই দাদারা তো ক্ষেপে আগুন! বড়দির সঙ্গে তারা সম্পর্ক পর্যন্ত ত্যাগ করেছে।'

কে একজন পেছন থেকে মন্তব্য করল, 'অমন স্বার্থপর দাদাদের ধরে পেটানো দরকার।' সারা ক্লাশ হাসিতে ভেঙে পড়ল।

জয়া বলল, 'এখন আমার শেষ প্রশ্ন। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি কী? কি ভাবে তাদের মিলন আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে?' বলেই জয়া সারা ক্লাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু কোন জবাব এল না কারুর কাছ থেকে। হঠাৎ যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এল!

'কী ব্যাপার—সবাই অমন চুপ মেরে গেলে আলোচনা হবে কেমন করে?' হাসতে হাসতে বলল জয়া, 'শান্তা, তুমিই তো আলোচনা চেয়েছিলে। এখন কথা বলছ না কেন?'

শান্তা উঠে দাঁড়াল। দেখলেই মনে হয় একটু ঘাবড়ে গেছে। সে মাথা নিচু করে বলল, 'এ-সম্পর্কে আপনার মতটাই আমরা শুনতে চাই।' বলেই বসে পড়ল সে।

'বেশ, তা হলে আমার মতটাই শোন।' জয়া বলতে শুরু করল, 'অতীতে যাই ঘটে থাক, এ-যুগের আদর্শ হল পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার। সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপারে। সমান মর্যাদার ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসাই কেবল তাদের জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।' কথাগুলো বলে জয়া একটু থামল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'এখন তোমরা ভেবে দেখ, যতক্ষণ তাদের মধ্যে এই প্রেম-ভালবাসা থাকে ততক্ষণ কি তারা ডিভোর্সের

কথা ভাবতে পারে? এ কি কখনও সম্ভব? ডিভোর্সের পথে তখনই তারা যায়, যখন তারা বুঝতে পারে তাদের হৃদয়ের ভালবাসা, সুখ আনন্দ সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা। অতএব ঐতিহ্যের প্রশ্নটা শুধু নারীর বেলা উঠল কেন? ডিভোর্সের পর পুরুষ যদি নতুন করে ভালবাসতে ও বিয়ে করতে পারে, মেয়েরাই বা পারবে না কেন? ঐতিহ্য? না, তাদের মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি নেই, এমন ঐতিহ্য আজকের নারী-সমাজ মেনে নিতে পারে না। আশা করি, তোমরা অধিকার ও আত্মমর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটাকে বিচার করবে।"

জয়া কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে আসছিল। শান্তা পেছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধরল।

'দিদি, আমাকে ক্ষমা করুন।' শান্তার চোখে জল টলমল করছে।

জয়া ঠিকই অনুমান করেছিল তা হলে!

'বিশ্বাস করুন, আমি নিজের ইচ্ছায় ওটা লিখিনি।'

আর একটু হলে শান্তা হয়ত নামটাই বলে ফেলত, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে জয়া বলল, 'থাক, শান্তা। এই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি কিছু মনে করিনি।' তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বাস ধরতে এগিয়ে গেল সে। তার বুঝতে বাকি নেই, কার উস্কানিতে শান্তা এ-কাজ করেছে।

এখানেই কি শেষ? মা-এর রিঅ্যাকশন তো আরো সাংঘাতিক। শুনে কী রাগ! মাকে আগে কখনো অমন রাগতে দেখেনি জয়া।

'এই বুঝি তোদের পার্টি করার ফল? ভাগ্য ভাল, তোর বাবা বেঁচে নেই। লজ্জায় হার্ট ফেল করে মরে যেতেন

তিনি মেয়ের কাণ্ড দেখে। ছিঃ ছিঃ—আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না তোর জন্য।'

মা-এর কথার জবাব কড়া ভাবেই দিতে যাচ্ছিল জয়া, কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল তাঁর ব্লাড প্রেসারের কথা। সে জোর করে নিজেকে সামলে নিল।

ছোট বৌদি তার ঘরে জয়াকে ডেকে নিয়ে মিষ্টি করে বলল 'যাই বল ভাই ছোট্‌দি, তোমার সাহস আছে! আমার তো ইচ্ছে করে তোমার কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার পাঠ নিতে। তোমার ছোটদার মত একটা নীরস লোকের হাতে পড়ে জীবনটা কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে!'

'তাই নাকি?' হেসেই জবাব দিয়েছিল জয়া, 'অযথা পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতা তোমার জন্য নয়। ছোট্‌দার সংসারে পুতুল সেজে বেশ তো আছ!'

না, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুর মনে জয়ার জন্য এতটুকু সহানুভূতি নেই। সবার চোখে সে দেখতে পায় বিদ্রূপের দৃষ্টি। অসহ্য লাগে। তার চেয়ে এই ভাল। সবার কাছ থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে এনে নিজেই নিজের বিচ্ছিন্নতাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। কলেজের সময়টুকু বাদ দিলে সারাটা দিন অখণ্ড অবসর। শুয়ে-বসে ভাবা। বই পড়া। আর স্মৃতিচারণ। হ্যাঁ, পেছনের ফেলে আসা দিনগুলিকে আজকাল বড্ড বেশি করে মনে পড়ে জয়ার। সেই কত বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে শান্তনুর কাছে তার রাজনীতির দীক্ষা! তখন থেকে প্রতিটি আন্দোলন ও লড়াই-এর সঙ্গে সে ছিল সক্রিয়ভাবে যুক্ত। কখনও পিছিয়ে থাকে নি। উপায় ছিল না থাকার। শান্তনু তাকে ঠেলে দিয়েছে সামনের দিকে। তার পরে এল পার্থ। সে-ও তাকে কাজের মধ্যেই জড়িয়ে রাখতে চেয়েছে। চেয়েছে বিপ্লবী বানাতে।

আর আজ ঘরে বসে কর্মহীন দিন গুণতে হচ্ছে তাকে! এমনি শূন্যতার মধ্যে কি সারা জীবন কাটাতে হবে? তা হলে যে পাগল হয়ে যাবে জয়া! এই সময় টুকুনটা কাছে থাকলে বোধ হয় এত খারাপ লাগত না। নিজের ওপর রাগ হয়। শান্তনুর প্রতি অতটা উদারতা দেখাতে গিয়ে তার কাছে টুকুনকে না পাঠালে কি চলত না? টুকুন ছাড়া যে এই পৃথিবীতে তার আপন বলতে আর কেউ নেই—এই কথাটা একবারও তার মনে পড়ল না কেন? একটা বাড়িতে অমন একা-একা থাকা তার পক্ষে কতদিন সম্ভব হবে? মেয়েটাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

জয়া ঠিক করে ফেলে, টুকুনকে নিয়ে আসবে। শান্তনু হয়ত একটু শক্ পাবে—তা হলেও করার কিছু নেই! কালই জয়া যাবে তাকে আনতে। শান্তনু আপত্তি জানালেও সে শুনবে না। কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জয়া একটু ভয় পেয়ে যায়। যদি শান্তনু বলে বসে—'এত বছর টুকুনকে ছাড়া তোমার চলছিল কেমন করে? তাকে তো ফেলে রেখেছিল পরের বাড়িতে!' তখন জয়া কী জবাব দেবে? তাছাড়া টুকুন নিজেই যদি আসতে না চায়? এখন সে তো আর ছোট নেই! তার মামণি যে নিজের সুখের জন্য তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল—সেটা কি সে বোঝে না?

ভীষণ অসহায় বোধ করে জয়া। ক্ষোভ ও আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় কান্না পেয়ে যায়। তার সব রাগ গিয়ে পড়ে শান্তনুর ওপর। সেই তার জীবনের এই ক্ষতির জন্য দায়ী।

হঠাৎ জয়ার খেয়াল হয়—অনেক রাত হয়ে গেছে। বেড-সুইচটা টিপে আলো জ্বালিয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। মাঝে মাঝে সে পরীক্ষা করে দেখে ট্যাবলেট ছাড়া ঘুম হয় কিনা! আজও সে তাই দেখছিল। কিন্তু ঘুমের কোন লক্ষণ নেই। তার বদলে মাথায় এসে ভর করে আজে-বাজে ভাবনা। অতএব ভাবনা-

ঘটিত ঘনিষ্ঠতাও গড়ে ওঠে, তাতেই বা জয়ার কী এসে যায়? সে নিজেকে শাসন করেছে বারবার। তবু চিন্তাটাকে মাথা থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে পারেনি। বুকের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করেছে।

টুকুন বলেছিল, 'জান মামণি, একটা মজার খবর!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

তারপর জয়া শুনেছিল খবরটা। অবিশ্যি টুকুনের খুশি হবারই কথা। ইস্কুলে যদি বাপি বা মামণির একজন বন্ধু টিচার হয়ে আসে, তার খুশি না হবার কারণ নেই।

শান্তনু বলেছিল, 'কেতকী ওদের স্কুলে জয়েন করেছে।'

'তাই নাকি?' জয়ার স্বরে বিস্ময়, 'ও যে বলেছিল খড়্গপুর ছেড়ে আসবে না!'

'কী জানি—এসে তো গেছে।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল শান্তনু।

'ও কি আসে এখানে?' আবার প্রশ্ন করেছিল জয়া।

জবাব দিয়েছিল টুকুন। উৎসাহের সঙ্গে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ। পিসিমণি তো প্রায়ই আসে। আমাকে কত বই দিয়েছে। জান মামণি, ইস্কুলে টিফিনের সময় আমাকে ডেকে নিয়ে টফি দেয়। আমার বন্ধুরা আমাকে খুব হিংসে করে এইজন্য।'

'এ খুব অন্যায়।' ভেতরের জ্বালাটাকে যথাসম্ভব চাপতে চেষ্টা করে বলেছিল জয়া, 'সহপাঠিনীদের মনে ঈর্ষা জাগে এমন কিছু করা তার উচিত নয়।'

শান্তনু কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে থাকবে তার কথায়। সে বিষয়টাকে চাপা দেবার জন্যই বোধহয় বলেছিল, 'হ্যাঁ জয়া, পরে বলতে হয়ত ভুলে যাব! কেতকী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রবিবারদিন তাকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি। তুমিও চলে আস না সেদিন—আসবে?'

'না।' বলল জয়া, 'আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে সেদিন।'

মিথ্যে কথাটা তৎক্ষণাৎ বানিয়েই বলতে হয়েছিল তাকে। উপায় ছিল না। কেতকী সম্পর্কে হঠাৎ তার মনে একটা বিরূপ ভাব দেখা দিয়েছিল—সেটা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব ছিল না জয়ার পক্ষে। তাছাড়া কেতকী কি ইচ্ছে করলে যেতে পারে না তার বাড়িতে, এতই যদি দেখা করার ইচ্ছে? শান্তনুর বাড়িতে আসতে পারছে, আর শুধু তার ওখানে যেতে বাধা? সব বুঝতে পারে জয়া।

প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে জয়া টুকুনকে জিজ্ঞেস করল, 'টুকুন, তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে?'

'ভাল চলছে মামণি', সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল টুকুন, 'আমি রোজ বাপির কাছে পড়ি। একজন টিচারও আমাকে পড়াতে আসেন।'

টিচার! অবাক হয়েছিল জয়া। শান্তনু সেটা লক্ষ করে বলেছিল, 'অঙ্ক আর সায়েন্সে একটু উইক। তাই একজন টিউটর রেখে দিলাম। টুকুনের ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে। ডাক্তারি পড়তে হলে সায়েন্সে খুব ভাল হওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, মামণি—আমি ডাক্তারি পড়ব।'

'বেশ তো! তাই পড়ো।'

হেসেই কথাটা বলেছিল জয়া। কিন্তু তার ভেতরে ছিল একটা জ্বালা। মেয়ের ভবিষ্যৎ স্থির করবার আগে শান্তনু তার সঙ্গে একটু পরামর্শের প্রয়োজনও বোধ করল না? মাত্র দিন পনের সে এ-বাড়িতে আসে নি! এর মধ্যে কত কি ঘটে গেল। কেতকীর

কথা কেউ ভাবছি না। কিন্তু এই অন্ধগলির ভেতর থেকে আমাদের সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে ইতিহাস কাউকেই রেহাই দেবে না।'

কফি হাউসে বসে কথা হচ্ছিল তাদের মধ্যে। জয়া গিয়েছিল কলেজ স্ট্রীটে কয়েকটা বই কিনতে, সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রথীনের। ব্যক্তিগত সংবাদ বিনিময়ের পর আলোচনার মোড় ঘুরল রাজনীতির দিকে।

এক সময় জয়া বলল, 'আমার কী মনে হয় জান রথীন? আমরা বোধ হয় আমাদের দেশের মানুষ, তাদের অবস্থা বা চিন্তা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত নই। সেই জন্যই তাদের পথ দেখাতে আমরা বারবার ব্যর্থ হয়েছি—তারজন্য ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছে আমাদের সবাইকে।'

কফি আসে। জয়া বলে, 'আর কিছু খাবে?'

'না।' জবাব দেয় রথীন।

কফি খেতে-খেতে জয়ার মনে পড়ে শুভেন্দুর কথাটা। সে বলেছিল পার্টিগুলোর ভেতরে নাকি কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে। নীতির চেয়ে ক্ষমতার স্বার্থ তাদের কাছে বড়। এই ক্ষমতা বজায় রাখতে তারা সব কিছু করতে পারে। অথচ সাধারণ কর্মীরা সেটা বুঝতে পারে না। বুঝলেও প্রশ্ন তুলবার মত সাহস তাদের নেই। জয়া নিজেই কি বুঝতে পেরেছিল সেদিন? বরং মনে হয়েছিল, সে যা করছে সেটা আসন্ন বিপ্লবের স্বার্থে। অথচ কোথায় বিপ্লব? সব ফাঁকা বুলি। এ যেন কর্মীদের ধরে রাখার জন্য এক রকমের টোপ। আফিংয়ের নেশার মত কাজ করে।

এই জন্যই জয়ার দুঃখটা এত বড় হয়ে উঠেছে। একটা বড় স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। শুধু ভুল। পাহাড়-প্রমাণ ভুল। সে-ও আজ শুভেন্দুর মতই হতাশের দলে।

'কী ভাবছ?' রথীন জয়ার চোখে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করল।

'আজকাল বড্ড হেল্পলেস মনে হয় নিজেকে।' জয়ার মুখে একফালি করুণ হাসি। সে আবার বলল, 'আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি রথীন।'

রথীন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। জয়ার দিকে চেয়ে থেকে কিছু একটা ভাবছিল যেন। এক সময় বলল, 'জয়া, এক কাজ কর— এভাবে একা না থেকে টুকুনকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। এসময় তোমার কাছে তার থাকা দরকার।'

'না না,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জয়া, 'শান্তনুর খুব কষ্ট হবে। টুকুন তার কাছেই থাক।'

কিন্তু মনে মনে জয়া অনুভব করল, এই সময় একমাত্র টুকুনই তাকে শান্তি দিতে পারে। সে ছাড়া তার আপন বলতে আর কে-ই বা আছে? একটা সত্য এতদিন চাপা ছিল তার কাছে। মানুষ একা বাঁচতে পারে না। এমন কি বাইরের জগতের বন্ধনও তার পক্ষে সব নয়। আপনজন পরিবেষ্টিত একটি পরিবারের স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ছাড়া মনের শূন্যতা ঘোচে না। সেই দিক থেকে সে আজ রিক্ত। অথচ একদা তার সবই ছিল।

শান্তনুর ফোন পেয়ে অবধি জয়া ভাবছিল যাবে কিনা, যদিও সে তাকে যাবে বলেই কথা দিয়েছে। প্রায় একমাস সে তার বাসায় যায় নি। ইচ্ছে করেই যায়নি। টুকুনকে দেখতে না যাওয়া যে তার পক্ষে কতখানি কষ্টের, সেটা সে ছাড়া আর কে বুঝবে? কতবার ইচ্ছে হয়েছে যেতে। তবু সে যায়নি। দমন করেছে ইচ্ছেটাকে। অথচ না যাওয়ার কারণটা কত তুচ্ছ! হয়ত জয়া যা ভেবেছিল, তা আদৌ সত্যি নয়। হলেও সেটা নিয়ে শান্তনুর ওপর তার রাগ বা অভিমান হবে কেন? ভাবতেও লজ্জা লাগে জয়ার। শান্তনু এখন বন্ধুর মত। কেতকী যদি তার কাছে আসে, এমন কি দুইজনের মধ্যে যদি হৃদয়-

গুলোকে তাড়াবার জন্য ঘুমের ট্যাবলেট তাকে খেতেই হবে। টেবিলের ওপর থেকে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাশটা তুলে নিয়ে জলের সঙ্গে দুটো ট্যাবলেট খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে সে।

১৬

জয়া ক্লাশ থেকে সবে বেরিয়ে এসেছে—অফিস-রুম থেকে খবর এল, তার ফোন। একটু অবাক হল সে। কে তাকে ফোন করতে পারে? পার্থ নয় তো? কিন্তু সে তো তার সঙ্গে আজকাল সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে! কৌতূহল নিয়ে জয়া এসে অফিস রুমে ঢুকল। ক্লার্ক রিসিভারটা তার হাতে তুলে দিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নিজের কাজ করতে লাগল।

'হ্যাল্লো……'

'জয়া! আমি শান্তনু!'

'কী ব্যাপার? তোমরা কেমন আছ?'

'ভাল। তুমি? তুমি ভাল আছ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আসছ না কেন?'

জয়া কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। একটু ইতস্ততঃ করে। শান্তনু আবার বলে, 'টুকুন খুব অস্থির হয়ে উঠেছে। ওর দিকটা তোমার ভাবা উচিত। আজ আসবে?'

'আজ?' আবার ইতস্ততঃ করে জয়া।

'হ্যাঁ। অসুবিধে না থাকলে কলেজ থেকে সোজা চলে আস না কেন? দুপুরে এখানেই খাবে। আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কিসের ?' জয়া বলে, 'বেশ, আসব। তোমার কি আজ ছুটি নাকি ?'

'ছুটি নিয়েছি। তা হলে ছেড়ে দিচ্ছি।' শান্তনু বলল। রিসিভারটা রেখে জয়া বেরিয়ে আসে।

সেদিন উত্তেজনার মাথায় জয়া ঠিক করেছিল টুকুনকে নিজের কাছে এনে রাখবে। এখন পার্থ নেই, অতএব তার কাছে থাকতে টুকুনের আপত্তি হবে না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে নিদ্রাহীন একাকীত্বের যন্ত্রণার মধ্যে যে কথা সে সহজে ভাবতে পেরেছিল, দিনের আলোয় তার স্বপক্ষে মনের সায় মিলল না। শান্তনুর কথা ভেবে তাকে নিরস্ত হতে হল। সে খুব দুঃখ পাবে। তাকে দুঃখ দেবার শক্তি জয়ার নেই। বরং তাকে সুখী করতে সে নিজে অনেক দুঃখ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। আশ্চর্য লাগে জয়ার। তার বুকের অভ্যন্তরে শান্তনুর জন্য এত ভালবাসা কেমন করে লুকিয়েছিল এতদিন ? সেদিন রথীনের কাছে জয়া জানতে পারল নিজের পার্টির ভেতরে শান্তনু বর্তমান ভুল নীতির বিরুদ্ধে দারুণভাবে ইনার-স্ট্রাগল চালিয়ে যাচ্ছে। শুনে তার প্রতি জয়ার শ্রদ্ধা-ভালবাসা আরও গভীর হয়ে উঠল। এটাই সে তার কাছে আশা করে। শান্তনু তার বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করেনি। নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ীই সে পথ চলে। যতক্ষণ মনের সঙ্গে না মিলবে, সায় দেবে না সে। বরাবর এই দেখে এসেছে জয়া। এখনও তার সেই স্বভাব রয়ে গেছে।

'তোমরা কী চাও রথীন ?' জিগ্যেস করেছিল জয়া।

রথীন শান্তভাবে বলেছিল, 'দেখ জয়া, বাষট্টির পর থেকে তত্ত্বের বিশুদ্ধতা নিয়ে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ কম হল না। কিন্তু বাস্তবে তার ফল কী দাঁড়িয়েছে ? আমরা কেউ কি একটুও এগোতে পেরেছি ? আমার তো মনে হয় ভুল করতে করতে আমরা আজ একটা অন্ধ গলির মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। এর থেকে বেরোবার

আবির্ভাব ও তার এ-বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত। টুকুনের জন্য টিচার। নিশ্চয়ই কেতকীর পরামর্শ এর পেছনে ছিল।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালে শান্তনু তাঁকে ভেতরে আহ্বান জানিয়ে বলেছিল, 'আসুন মাষ্টারমশাই!' তারপর তাঁকে জয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—'টুকুনের মা।'

'নমস্কার!' মাষ্টার মশাইর চোখে একটু বিস্ময়। তিনি বললেন, 'টুকুন পড়াশুনায় বেশ ভাল। একবার দেখিয়ে দিলে ঠিক ধরে নিতে পারে।'

জয়া মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল, 'ওর বাপির গুণটা পেয়েছে।'

টুকুন পাশের ঘরে মাষ্টারের কাছে পড়তে চলে গেলে জয়া শান্তনুকে বলেছিল, 'টুকুনের জন্য সব তুমি একা করবে কেন? আমারও কিছু করা উচিত।' শান্তনু বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেনি, তাই জয়া প্রস্তাবটা খুলেই রেখেছিল তার কাছে—'ওর জন্য খরচপত্রের কিছুটা আমাকেও বহন করতে দাও।' তারপর সে তার ব্যাগ থেকে তিনটা একশো টাকার নোট বের ক'রে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল।

শান্তনু অবাক হয়ে বলেছিল, 'এ-কি! টাকা দিচ্ছ কেন?'

'তোমাকে দিচ্ছি না। দিচ্ছি টুকুনকে।'

'তা জানি। কিন্তু এখন থাক।'

'থাকবে কেন?'

শান্তনু জবাব না দিয়ে চুপ করেছিল, জয়া আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'জবাব দিচ্ছ না যে?'

একটু ইতস্ততঃ করে শান্তনু বলেছিল, 'তুমি তো অনেক দিয়েছ।' জয়া ঠিক বুঝতে পারেনি তার কথা। সে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে!

শান্তনু ধীরে-ধীরে বলেছিল, 'রথীন আমাকে সব বলেছে। তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ জমে গেছে জয়া।'

'তুমি সেটাকে ঋণ মনে করেছ ?'

'তুমি যে-ভাবেই দিয়ে থাক, আমি সেটাকে আর কী ভাবতে পারি ?'

জয়া জবাব দিতে পারেনি। প্রশ্নটা তাকে এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল যে তার পক্ষে সেই সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তার সব রাগ গিয়ে পড়েছিল রথীনের ওপর। নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন সে তাকে বলতে গেল ? কী দরকার ছিল বলার ?

'শোন জয়া, এ আমি কোনদিন ভুলব না যে, তোমার দেওয়া টাকায় আমি জীবন ফিরে পেয়েছি। আমি চেষ্টা করব ধীরে-ধীরে টাকাটা শোধ করে দিতে।'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

যান্ত্রিকভাবে জবাব দিয়েছিল জয়া। সে আর তাকাতে পারছিল না তার দিকে। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে বসেছিল সে। হ্যাঁ, একদা অন্ধ বিদ্বেষে শান্তনুর প্রতি সে কম নিষ্ঠুর আচরণ করেনি, কিন্তু নিষ্ঠুরতার বিচারে সে বোধহয় তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এত কঠিন তার হৃদয় ! অভিমান ও ক্ষোভে জয়ার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল। কোন দুর্বলতা প্রকাশ করেনি তার সুমুখে। কিছুক্ষণ বাদে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর মাসাধিক কাল আর ও-মুখো হয়নি সে।

কলেজ ছুটির পর রাস্তায় এসে জয়া ভাবছিল যাবে কিনা। ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতেই এক সময় একটা ট্যাক্সির সামনে এসে সে দাঁড়াল। তারপর ভেতরে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'কসবা।' সে মনে-মনে বলল—'শান্তনুর জন্য নয়, টুকুনের জন্যই আমাকে যেতে হবে।'

১৭

শান্তনুর বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতেই রাজুর মার সঙ্গে দেখা হল। সে কাছে এগিয়ে এসে বলল—'এসে গেছ দিদিমণি! ভেতরে যাও। আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসছি।'

'দোকানে কেন—এই দুপুরে?'

'দই আর মিষ্টি আনতে যাচ্ছি।'

'কী ব্যাপার বলতো? তোমার দাদাবাবু হঠাৎ খেতে নিমন্ত্রণ করলেন! কোন উপলক্ষ আছে নাকি?'

'না। একটু আগে এসে আমাকে খবর দিলেন তুমি খাবে। আজ তেমন কিছু রান্নাও হয়নি। তাই তো দোকানে যাচ্ছি।'

'মিষ্টি খাইয়ে পেট ভরাবে বুঝি? দরকার নেই। ঘরে চল। যা রেঁধেছ তাতেই হবে।'

রাজুর মা শুনল না। 'এক্ষুণি চলে আসব,' বলে সে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। শান্তনু বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। জয়াকে দেখে সে স্মিতহাসি দ্বারা অভ্যর্থনা জানাল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ারটাকে ফ্যানের তলায় টেনে বসল জয়া। শান্তনু রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফ্যানের স্পীডটা একটু বাড়িয়ে দিল।

'টুকুন কি স্কুলে?' জিজ্ঞেস করল জয়া। অবিশ্যি জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না। বোঝাই যায়। বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে ছুটে আসতো।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল শান্তনু।

'তুমি হঠাৎ ছুটি নিলে যে?'

'এমনি।'

'শরীর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু একটা মানসিক অবসাদ। কাজের উৎসাহ পাইনা।'

'আগে তো এসব ছিল না তোমার।'

'এখন হয়েছে। হয়ত বয়সের জন্য। বয়সটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।'

তা ঠিক। বয়স এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দাঁড়িয়ে থাকে না। জীবনের এই দিকটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেনি জয়া। কিন্তু ভাবার সময় হয়েছে। শান্তনু তার চেয়ে আর কত বড় হবে? বড়জোড় চার বছরের ব্যবধান। তা হলে তার বয়সও কম হল না। চল্লিশ ছুঁতে চলেছে। হ্যাঁ, আজকাল সেটা টের পায় জয়া। নিজের চোখেই ধরা পড়ে। বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়ালে কিম্বা স্নান-ঘরে নিজের উন্মুক্ত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে কষ্ট হয় না। শরীরের মধ্যে বয়স তার রেখা আঁকতে শুরু করেছে, তাকে ঠেকানো যাবে না—জানে সে। তবু মন চায় না এই নির্মম সত্যটাকে মেনে নিতে। তাই দেহের জরাকে এড়াতে না পারলেও মনের জরাকে স্বীকার করতে চায় না জয়া। চিন্তা-ভাবনা ও কাজের মধ্যে সে দুর্জয় করে রাখতে চায় মনের যৌবনকে।

জয়া বলল, 'শান্তনু, তুমিই না একদিন বলেছিলে, সত্যিকার জরা আসে তখনই, যখন জীবনে জ্ঞানের তৃষ্ণা নষ্ট হয়ে যায়, জীবন থেকে নেওয়ার অথবা মানবসমাজকে দেওয়ার মত একজনের আর কিছু থাকে না।' কথাটা বলে সে শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শান্তনুর চোখে বিস্ময়। তার দৃষ্টি জয়ার মুখের ওপর আবদ্ধ।

তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারে না সে। একটু আনমনা দেখায় তাকে। এই মুহূর্তে তার মন কি চলে গেছে অনেকগুলি বছরের সীমা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই যৌবন কল্লোলিত চত্বরে? সে কি অনুভব করতে পারছে নিজের মধ্যে তার সেদিনকার সেই দুর্মদ তারুণ্যের প্রাণপ্রাচুর্য্য? তাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আজ। মুখে ম্লান হাসি। শান্তনু যেন এক পরাজিত সৈনিক। অনেক বছরের অবিরাম যুদ্ধে সে ক্ষতবিক্ষত। জয়ার মায়া হয়। না, সে তার বিষণ্ণ মুখ দেখতে চায় না। শান্তনু আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক সৈনিকের সংগ্রামী মনোবল নিয়ে।

জয়া বলে, 'তোমার সব কথা আমি রথীনের কাছে শুনেছি। তুমি বিশ্বাস কর শান্তনু, আজ আমারও একই ভাবনা। কিন্তু আমি পথ পাচ্ছি না। তবুও আমি বিশ্বাস হারাতে চাই না। আমাদের যদি হার মানতে হয়, তবে কী নিয়ে আমরা বাকি জীবন কাটাব?'

শান্তনু বোধহয় বুঝতে পেরেছে, জয়া তাকে উৎসাহিত করার জন্যই কথাগুলো বলেছে। তার নিজের কথাও নিশ্চয়ই সে শুনেছে রথীনের কাছে। সে বলল, 'আমিও কোন আশার ছবি দেখতে পাচ্ছিনে জয়া। নেতৃত্বের স্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন চিন্তা না আসবে, ততক্ষণ কোন আশা নেই। সেই সম্ভাবনা কম। তোমার বা আমার মত দু'চারজনের মনোভাব পার্টি-নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে না।'

'তবু আমার বিশ্বাস, একদিন সবাই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে।'

'পারবে হয়ত, কিন্তু ততদিনে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার নিজের কথা বলতে পারি, পার্টির ভেতরে থেকে কাজ করা বোধহয় আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। পার্টির ডিসিপ্লিন আমি ভাঙতে চাইনে।'

জয়া অবাক হয়ে বলে ওঠে, 'তুমি পার্টি ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ। এ ছাড়া আর কী করতে পারি?' শান্তনু বলে চলল, 'ইলেকশনে কয়েকটা সীট পাওয়ার লোভে কংগ্রেসের মত বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে এলায়েন্স মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে একা লড়ে সীট না পেলেও এতটা ক্ষতি হত না। অবস্থার সুযোগ নেওয়া আর সুবিধাবাদ এক নয়! পার্টি স্রেফ একটা সুবিধাবাদী লাইন নিয়ে বসে আছে।'

অনেকক্ষণ দু'জনের কেউ কথা বলে না। একটা ব্যাপার জয়া লক্ষ করেছে। এতদিন পর্যন্ত শান্তনু তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে সরাসরি কোন আলোচনা এড়িয়ে গেছে। তার চিন্তাধারা সম্পর্কে যতটুকু সে জেনেছে, সবই রথীনের মারফৎ। বহুকাল বাদে এই প্রথম সে স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলল। কারণটা জয়ার জানা নেই। হয়ত তার মনে জয়ার সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন-ভাবে যে-ক্ষোভ বা রাগ ছিল, সেটা এখন আর নেই। হয়ত সে বুঝতে পেরেছে, ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তারা এখন খুব কাছাকাছি। ভারী অদ্ভুত! যে-রাজনীতি একদা তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, তা-ই আবার তাদের কাছাকাছি টেনে এনেছে।

শান্তনুকে খুব বিচলিত দেখায়। এক সময় সে বলে, 'তুমি ভেবে দেখ জয়া। পার্টিগুলোর অবস্থা দেখলে মনে হয়, ইলেকশনে কয়েকটা সীট পেলেই যেন সোস্যালিজম এসে যাবে। এর জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি, ফল্স ভোটিং ইত্যাদি কোন কিছু করতে তারা পিছপা নয়। এর চেয়ে বড় ভণ্ডামী আর কী হতে পারে?'

শান্তনুর দৃষ্টি জয়ার চোখে। জয়া কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। চোখ নামিয়ে নেয়। একাত্তরের নির্বাচনের কথা মনে আছে তার। তাদের এলাকায় শান্তনুদের পার্টির একজন ক্যাণ্ডিডেট ছিল, কিন্তু তাদের কর্মীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি জয়াদের পাড়ায়। শান্তনু

একদিন জেদ করে কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল প্রচারের জন্য, কিন্তু পারে নি। রাস্তার মোড়েই তাদের আটকে দেওয়া হয়েছিল। তখন শান্তনু একা গিয়ে পার্থর সঙ্গে দেখা করল পার্টি-অফিসে। সেখানে তখন জয়াও ছিল। হঠাৎ শান্তনুকে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। দু'জনে চোখাচোখি হতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

শান্তনু সরাসরি পার্থকে বলেছিল, 'পার্থ, তোমরা কি ঠিক করেছ আমাদের কাজ করতে দেবে না?'

'এ আবার ঠিক করার কি আছে?' হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল পার্থ, 'আমরাও অনেক জায়গায় কাজ করতে পারছি না।'

'অন্যদের প্রচারে বাধা দেওয়া আমাদের নীতি নয়।' শান্তনু প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

'নীতির কথাটা অবান্তর। আসলে আপনাদের সংগঠন নেই—থাকলে আপনারাও বাধা দিতেন।' পার্থর কণ্ঠস্বরে শক্তির দম্ভ প্রচ্ছন্ন ছিল না। শুনতে জয়ারও কানে লেগেছিল। তার মনে হয়েছিল, পার্থ যেন ইচ্ছে করেই একটু রূঢ় হতে চেয়েছিল।

'না, দিতাম না। দিলে অন্যায় করা হত।'

'ঠিক আছে, যেদিন আপনাদের সংগঠনের জোর হবে, দেখব কি করেন।'

শান্তনু বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, এই নিয়ে আর কথা বলা বৃথা। সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। চলতি রাজনীতিতে সাংগঠনিক শক্তি একটা বড় ফ্যাক্টর। শক্তির জোরেই আধিপত্য বিস্তার করতে হয়! এই শক্তি যাদের নেই, তাদের মার খাওয়া ছাড়া উপায় কি? সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই কি এবার শান্তনুদের পার্টি বুর্জোয়াদের শক্তির সঙ্গে নিজেদের জুড়ে দিয়েছে? অস্তিত্ব রক্ষার দায় ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, তেমনি

দলগত জীবনেও কম নয়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, আদর্শগত মূল্যবোধ ইত্যাদি কথাগুলো এখন অর্থহীন। সেই দিক থেকে শান্তনু কিছুটা ব্যতিক্রম! অবশ্যই বেমানান বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে। জয়ার তো মনে হয়, সে যতটা না বস্তুবাদী, তার চেয়ে বেশি আইডিয়ালিষ্ট। স্বপ্নদর্শী! জয়া নিজেও কি তাই নয়? এইজন্যই বোধহয় শান্তনুকে সে এত ভালবেসেছিল—সে ভালবাসা রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত নিজের আশ্রয় খুঁজে পেতে ভুল করেনি!

রাজুর মা ঘরে ঢুকে তাড়া লাগাল, 'এ-কি, এত বেলা হল—খাওয়া-দাওয়া হবে কখন?'

তাই তো! এতক্ষণ শুধু গল্পই করে চলেছে তারা—দু'টো বেজে গেছে, খেয়াল নেই?

রাজুর মা বলল, 'দিদিমণি, তুমি তো ভোরে চান না করেই কলেজ যাও। চান করবে না?'

হ্যাঁ, করব।' উঠে পড়ে জয়া। শান্তনুকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার চান হয়ে গেছে?

'হ্যাঁ।' শান্তনু বলল, 'টুকুন-তো আজকাল রেগুলার শাড়ি পরে—ওর একটা শাড়ি নিয়ে গিয়ে তুমি চানটা সেরে আস। খুব বেলা হয়ে গেছে। আমারই খেয়াল করা উচিত ছিল।'

'তাতে কি হয়েছে? আমি কি অতিথি নাকি?'

স্নান সেরে এসে জয়া দেখল খাবার সাজানো হয়ে গেছে। ডাইনিং টেবিলের অভাব মোচন করেছে টুকুনের পড়ার টেবিলটা। সেটাকে বসার ঘরে এনে দু'দিকে দু'টো চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে।

জয়া একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'এ-কি! এটা টানবার কী দরকার ছিল? আমরা মেঝেতে বসেই খেতে পারতাম।'

'তাতে কী হয়েছে?' শান্তনু বলল, 'একটু আরাম করে বসে

খাওয়া যাবে।'

'মেঝেতে বসে খেতেও আরাম কম নয়,' ক্ষুণ্ণ মনে জয়া বলল, 'আসলে তোমরা আমাকে অতিথি ছাড়া কিছু ভাবতে পারছ না।'

শান্তনু বোধহয় কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করছিল। সে চুপ করে রইল। আবহাওয়াটাকে সহজ করার জন্য জয়া বলল, 'চল, খেতে বসা যাক। খিদে পেয়েছে খুব।'

পোস্তর বড়া দেখে জয়া হাসতে হাসতে বলল, 'রাজুর মা দেখছি আমাকে ভোলেনি। ও চলে আসার পর আর পোস্তর বড়া খাওয়া হয়নি।'

রাজুর মা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'বল কি দিদিমণি? তুমি পোস্তর বড়া এত ভালবাস, আর মেয়েটা তাই বানিয়ে দেয় না! কেন, বলতে পার না ওকে বানিয়ে দিতে?'

'কাজল ছেলেমানুষ—ওযে কোনরকমে চালিয়ে নিচ্ছে তাই যথেষ্ট। এত সব ঝামেলার রান্না ও পারবে কেন।'

'ওমা—এর মধ্যে আবার ঝামেলা কি? ঠিক আছে, আমি একদিন গিয়ে ওকে শিখিয়ে দিয়ে আসব।'

'তাই করো।' হাসতে হাসতে বলল জয়া।

আবার সেই রসকদম্ব! খাওয়ার শেষে দই-এর সঙ্গে একটা প্লেটে গোটা কয়েক বড় সাইজের রসকদম্ব এনে জয়ার সামনে রাখল রাজুর মা। জয়া মুখ তুলে শান্তনুর দিকে তাকাল। সে ভালমানুষী মুখ করে একমনে খাচ্ছে।

'এ তো আমি খাইনা রাজুর মা,' বলল জয়া।

'বল কি দিদিমণি!' রাজুর মা বলে, 'দাদাবাবু যে বারবার করে বলে দিল এই মিষ্টি আনতে!'

'সে নিজে এই মিষ্টি ভালবাসে কিনা—তাই আনতে বলেছে। বেশ, তাকেই দাও এ-গুলো।'

রাজুর মা বিমূঢ়। সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শান্তনু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার সে জোরে হেসে উঠল।

খাওয়ার পর শান্তনু বলল, 'তুমি কি একটু বিশ্রাম নেবে ? তা হলে পাশের ঘরে টুকুনের বিছানায় শুয়ে পড়গে।'

'নাঃ—দরকার নেই।'

জয়া বই-এর র‍্যাকটার সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ বইপত্র ঘাঁটে। অনেক নতুন বই কিনেছে শান্তনু। জয়া জানে এটাই তার একমাত্র হবি। বেতন পেয়েই সে কলেজ স্ট্রীটে ছুটবে বই কিনতে। জয়া বিতর্কমূলক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর লেখা একটা বই তুলে নিয়ে বলে, 'এটা আমি নিচ্ছি। হ্যাঁ ভাল কথা—তোমার অনেক বই কিন্তু আমার কাছে পড়ে রয়েছে। তুমি চাও তো পাঠিয়ে দিতে পারি।

'পাঠিয়ে কি হবে, আমার তো রাখারই জায়গা নেই', শান্তনু জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে, বলল, 'তাছাড়া বইগুলো শুধু আমার হবে কেন ? দু'জনের টাকা থেকেই সেগুলো কেনা হয়েছিল।'

এক সময় শান্তনু বলল, 'তোমাকে আমার একটা কথা বলার আছে জয়া। এখন শুনবে ?'

'বেশ, বল।' জয়া চেয়ারটা একটু টেনে শান্তনুর সামনে বসে।

শান্তনু কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'জয়া, আমার মনে হচ্ছে, টুকুনকে তোমার কাছে নিয়ে রাখাই ভাল হবে।'

'কেন ? সে এখানে থাকায় তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?'

'অসুবিধে ! বল কি ?'

'তবে এ-কথা বলছ কেন ?'

শান্তনু নিরুত্তর। জয়া বলল, 'টুকুন কী চায় ?'

'ওকে এখনও বলিনি। ও তো শুনলে খুশিই হবে।'

'না, হবে না। তাই যদি হবে এতকাল ওকে মার কাছে রাখতে হল কেন?'

'সে তো অন্য কারণে।' বলেই শান্তনু একটু অপ্রস্তুত হয়। আবার বলে, 'কিছু মনে করো না।'

জয়া একটু করুণ হেসে বলে, 'মনে করার কি আছে? তুমি মিথ্যে বল নি। মা-এর এমনি ঘটনাকে কোন সন্তান কি সহজভাবে নিতে পারে?'

কিছুক্ষণ আবার দু'জনই নীরব।

'কই আমার প্রস্তাবটা সম্পর্কে কিছু বললে না?' শান্তনু মনে করিয়ে দেয়।

জয়া সরাসরি শান্তনুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'আচ্ছা শান্তনু, পার্থিব সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ির কথাটা কি টুকুন জানে?'

'হ্যাঁ, জানে। একদিন তার দিদাকে দেখতে গিয়েছিল—তাঁর কাছেই শুনেছে।'

'ওর কী রিঅ্যাকশন? কিছু বলেনি তোমাকে?'

শান্তনু নিরুত্তর। জয়া আবার জিজ্ঞেস করে।

'জয়া, এ-সব নিয়ে তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছ?' শান্তনু বলতে থাকে, 'ও ছেলেমানুষ। যাই বলে থাক, সেটা ওর সরল মনের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়?

'ওর আচরণটা কিন্তু সরল ছেলেমানুষী ধরণের নয় মোটেই।' জয়ার স্বরে ভেতরের ক্ষোভটা চাপা থাকে না।

'কেমন করে বুঝলে?

'সেটা বোঝা কি কঠিন? কেমন সুন্দরভাবে ভান করে যাচ্ছে যেন কিছুই ওর জানা নেই। এটা কি সরলতা?'

'এর জন্য তুমি ওকে দায়ী করতে পার না। আমিই ওকে

বলেছিলাম, তুমি নিজে থেকে না বললে ও যেন কিছু জিজ্ঞেস না করে। তুমি অযথা রাগ করছ জয়া। তুমিই বা ওকে বলনি কেন? এ-সব একেবারে না। বুঝবার মত ছোট তো এখন টুকুন নেই। ও অত্যন্ত সেনসিটিভ।'

হঠাৎ জবাব দিতে পারে না জয়া। কেমন অসহায় বোধ করে। কয়েক পলক শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলে, 'আমি মা হয়ে কেমন করে এ-সব ওকে বলি? এ যে আমার কত বড় লজ্জা!'

তাকে বাধা দিয়ে শান্তনু বলল, 'লজ্জা কেন? টুকুন সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে গড়ে উঠবে—সেটা কি তুমি চাও না? ওকে সেইভাবেই তৈরী করতে হবে। আমার তো মনে হয় ওকে তোমার সব বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল।' একটু থেমে শান্তনু আবার বলল, 'এইজন্যই আমি বলছিলাম, টুকুনকে তোমার কাছে নিয়ে রাখ। মা আর মেয়ের মধ্যে মানসিক ব্যবধান যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা তা হলে দূর হবে। তা ছাড়া—' কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সে। জয়া মুখ তুলে তার চোখের দিকে তাকায়।

শান্তনু বলে, 'তা ছাড়া, ও তোমার কাছে থাকলে তুমি অতটা লোন্‌লি ফিল করবে না। ভারী সুন্দর মেয়ে। খুব ভাল লাগবে তোমার। তুমি ভেবে দেখ।'

অনুকম্পা! এতক্ষণে জয়া বুঝতে পারে। যে অনুকম্পা একদিন সে শান্তনুকে দেখিয়েছিল, আজ সে তারই প্রতিদান দিতে চায়? সে কি মনে করছে পার্থর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে জয়া খুব ভেঙে পড়েছে? আর সেইহেতু তার জন্য কিছু করা দরকার? তাই যদি সে ভেবে থাকে, তবে তো তার মনের কোন খবরই সে রাখে না। জয়া মুখ তুলতেই দেখতে পায়, শান্তনু তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে—তার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

জয়া বলল, 'আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, শান্তনু।'

জয়ার এই একটা কথা হঠাৎ যেন দু'জনকে ছিটকে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শান্তনু মৃদু হেসে বলে, 'ঠিক আছে।' জয়া নিঃশব্দে জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। একফালি আকাশ তার নজরে পড়ে। শূন্য আকাশের বুকে একটা চিল উড়ছে। কেমন একা নিঃসঙ্গ মনে হয় পাখিটাকে। ঠিক তার নিজের মত।

পেছন থেকে টুকুনের কণ্ঠস্বর শুনে সচকিত হয়ে ওঠে জয়া।

'মামণি! তুমি কখন এসেছ?'.

টুকুন ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে অভিমানে থমথম করে মুখটা। সে বলে, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না। কেন তুমি এতদিন আসনি?'

জয়া মেয়েকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, 'আর এমন হবে না, মামণি। আমি সময় পেলেই আসব।'

টুকুনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ রে!' হাসতে-হাসতে জবাব দেয় জয়া।

টুকুনের সঙ্গে জয়া তার ঘরে আসে। টুকুন ইস্কুলের পোষাক ছেড়ে একটা শাড়ি পরে বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এলে জয়া জিজ্ঞেস করে, 'ইস্কুল থেকে ফিরে কী খাও?'

'ভাত। ভাত খেতে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি কী খেতে?'

'আমিও ভাত খেতাম।'

'তুমি ইস্কুলে ফুচকা খেতে? আর তেঁতুলের আচার? খেতে এ-সব?'

'খুব খেতাম। এইজন্য কম বকুনি খেয়েছি বাড়িতে?'

টুকুন জোরে হেসে ওঠে। বলে, 'তুমিও আমার মত। আমি রোজ খাই। বাপি সন্দেশ খেতে পয়সা দেয়—আমি তাই দিয়ে ফুচকা খাই, তেঁতুলের আচার খাই।'

পাশের ঘর থেকে শান্তনুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমি কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছি টুকুন!'

টুকুনের কণ্ঠে হাসির ঝর্ণা। সে চেঁচিয়ে বলে, 'কেন বাপি, মামণিও তো খেত—জিজ্ঞেস করে দেখ। আর তুমি যে ঘুঘনী খেতে!'

রাজুর মা রেশন তুলতে গেছে। জয়া এসে রান্নাঘরে ঢুকল। সে মিটসেফ থেকে খাবার বের করে থালায় সাজিয়ে টুকুনের ঘরে এনে তাকে খেতে দেয়।

মাছের কাঁটা বাছতে গিয়ে টুকুন হিমসিম খেয়ে যায়। জয়া বলে, 'এই মেয়ে, এত বড় হয়েছ—এখনও মাছের কাঁটা বেছে খেতে শেখনি?'

'শিখেছিলাম—এখন ভুলে গেছি।'

'বেশ কথা! শিখলে আবার কেউ ভোলে নাকি? রোজ কেমন করে খাও?'

'বাপি বেছে দেয়। এই জন্যই তো ভুলেছি।'

'বুঝতে পেরেছি। তোমার বাপি তোমাকে একটি অপদার্থ বানিয়ে ছাড়বে।' বলতে বলতে জয়া নিজে হাত লাগায়। কাঁটা বেছে মাছের সঙ্গে এক গ্রাস ভাত মেয়ের মুখে তুলে দেয়। টুকুন সেই ছোটবেলার মত মুখ হাঁ করে মা-এর হাত থেকে গ্রাসটা মুখে নেয়। তার দু'চোখে খুশি উপচে পড়ে। জয়ার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটন করে ওঠে। এই তার মেয়ে। মা হয়ে সে তাকে মাতৃস্নেহের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।

খাওয়া হয়ে গেলে আবার শুরু হয় টুকুনের কথা। মা-এর পাশে বসে অবিরাম সে বকে চলেছে। সবই তার ইস্কুলের গল্প। বন্ধুদের কথা, দিদিমণিদের কথা।

'জান মামণি, রিঙ্কি আর টুপাই কেমন হিংসুটে!'

'কেন, ওরা কি করেছে ?'

'ওরা বলে, পিসিমণি নাকি আগেই আমাকে প্রশ্ন বলে দিয়েছে। আমি হাফ-ইয়ার্লিতে ওদের চেয়ে বেশি মার্কস পেয়েছি কিনা !'

পিসিমণি মানে—কেতকী। জয়া বলে, 'তোমার পিসিমণি আজকাল আসে না ?'

'মাঝে মাঝে আসে।' টুকুন বলে।

জয়ার বুকের সেই যন্ত্রণাটা আবার মাথা চাড়া দেয়। না, সে এই নিয়ে ভাববে না। যে যা খুশি করুক। তার কিছু এসে যায় না তাতে। ঈর্ষার মত নীচ বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেবে না সে। শান্তনুর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে কোন বন্ধন নেই। এটাই বাস্তব সত্য।

টুকুনের ডাকে জয়ার অন্যমনস্কতা ভেঙে যায়।

'মামণি ! তুমি আমার কথা মোটেই শুনছ না।'

'হ্যাঁ, বল—শুনছি।' জয়া সচকিত হয়ে ওঠে।

এই টুকুন তার সর্বস্ব। তার সব আনন্দের উৎস ! হাসপাতালের সেই মুহূর্তটির কথা জয়া কি ভুলতে পারে ? কী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সে টুকুনকে পেয়েছিল। রাজনীতি করতে করতে তার নারীত্বের অনেক কোমল বৃত্তি হয়ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবুও টুকুনকে পাওয়ার মুহূর্তে তার হৃদয়ে জেগে উঠেছিল মাতৃত্বের এক আশ্চর্য অনুভূতি। ফুলের মত সুন্দর একটি শিশু যখন তার দু'টি কচি ওষ্ঠ দিয়ে তার স্তন স্পর্শ করত, তখন জয়া নিজের মধ্যে অনুভব করত এক অননুভূত আনন্দের শিহরণ। জয়া মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল—'টুকুন, তোর মাকে কিন্তু তুই ভালবাসিস।'

টুকুন অবাক হয়ে দেখে মা-এর দু'চোখ বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রুর ধারা। সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'আমি তো তোমাকে খুব ভালবাসি মামণি।

১৮

রাত্রি এগারোটার বুলেটিনে নির্বাচনের সংবাদ শুনে জয়া রেডিওটা বন্ধ করে দেয়। আর খবর শোনার জন্য রাত্রি জেগে লাভ নেই। অবস্থা কী দাঁড়াবে বোঝা হয়ে গেছে। জয়া ভাবতে পারেনি, পার্থরা বাহাত্তরের সাধারণ নির্বাচনে এ-ভাবে বিপর্যস্ত হবে। ফলাফল খুব ভাল হবে না, সে বুঝতে পেরেছিল। তাই বলে এ-ধরণের বিপর্যয় কল্পনাতীত। আজকের কাগজেই সে পড়েছে একজন নেতার বিবৃতি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা অপর পক্ষের কারচুপি আর রিগিং নাকি এর জন্য দায়ী। তারা জোর করে পোলিং বুথ দখল করে নিজেরাই ব্যালট পেপারে ছাপ দিয়ে বাক্সের মধ্যে পুরেছে। ভোটদাতারা ফিরে গেছে ভোট না দিয়ে। এ সবের সত্যতা অস্বীকার করে না জয়া। কিন্তু তার ভাবতে অবাক লাগে, হাজার হাজার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে কেমন করে অমন ব্যাপক রিগিং সম্ভব! পার্থদের অতবড় পার্টি সংগঠন কি ঘুমিয়েছিল? তারা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারেনি? তাহলে অমন সংগঠন নিয়ে তারা কেমন করে বিপ্লবের কথা বলে? জয়ার মনে হয়, নেতৃত্ব এখনও অন্ধ। তারা আসল সত্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। নইলে তারা বুঝতে পারত, শুধু অপর পক্ষের রিগিং নয়, তাদের নিজেদের কার্যকলাপও এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ক'বছর ধরে তাদের লক্ষহীন বন্ধ্যা রাজনীতি আর খুনোখুনি সাধারণ মানুষের মন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। পার্থ এখন কী ভাবছে—কে জানে? সে পাথরের মত শক্ত, তার স্নায়ুর শক্তি অপরিসীম—ভাবনা-চিন্তার ধার দিয়ে সে যায় না। অতএব সে আঘাতটা সামলে নিতে

পারবে সব দোষ অপর পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে।

সারারাত বোমা ফাটার শব্দে জয়া ঘুমুতে পারেনি। বাইরে কী যে ঘটছে, কিছু বুঝবার উপায় নেই। এত বোমাই বা আসে কোথা থেকে? মনে হয় যেন যুদ্ধের সন্ত্রাসী পরিবেশের মধ্যে তারা বাস করছে। কিন্তু এই যুদ্ধের কী লক্ষ? পরস্পরকে শুধু হনন? এ ছাড়া আর তো কিছু তার নজরে পড়ে না। শুধু বিদ্বেষ আর ঘৃণা। লক্ষহীন উন্মাদনা নিয়ে বিপ্লব হয় না। এর শেষ যে কোথায় তার জানা নেই। এই নিয়েই পার্থর সঙ্গে তার বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। যার শেষ পরিণতি ঘটেছে বিচ্ছেদে।

ভোরে কাজলের ডাকে জয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

'বেলা হয়ে গেছে। বাজারে যাব না?' কাজল বলল।

শুধু কি তার বাজারে যাওয়া? নিজেরও তো কলেজ রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কাজলকে বাজারের টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে শাড়িটা পরে তৈরি হয়ে নিল। টেবিলের ওপর ঢাকা-দেওয়া চা আর দু'পিস পাউরুটি খেয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। কাজলের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি রয়েছে। অতএব তার জন্য অপেক্ষা করার প্রশ্ন নেই।

বড় রাস্তার মোড়ে আসতেই দৃশ্যটা জয়ার চোখে ঠেকল। শহীদ বেদীটা ভেঙে চৌচির। একদিন সে যাদের সঙ্গে দল করেছে এবং যে কমরেডরা এতদিন এই মোড়ের দখলদার ছিল, তাদের কেউ সেখানে নেই। তার বদলে আছে কিছু নতুন মুখ আর কয়েকটি ছেলে যারা এক সময় পাড়া থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। জয়া বুঝতে পারল গতকাল সারারাত তাহলে এলাকা দখলের লড়াই হয়েছে! তার মানে, পুরনো কিছু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পেল আর কিছু লোক নতুন করে উদ্বাস্তু হল।

এক নজর ওদিকে তাকিয়েই জয়া বুঝতে পারল, সব ক'টি

ছেলের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। সে-ই যেন তাদের আলোচ্য বিষয়। কেমন অস্বস্তি বোধ করে সে। ঠিক সেই সময় একটি বাস এসে তাকে অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই দেয়। তাড়াতাড়ি সে বাসের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে।

জয়ার সাহসের অভাব নেই। অনেকরকম রাজনৈতিক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে সে জীবনের অনেকগুলি বছর পার করে এসেছে। তবু এসব যেন ভিন্ন ধরনের। নৈতিকতা বলে কিছু নেই। মানবিকতা অর্থহীন। জয়া অভ্যস্ত নয় এ-ধরণের রাজনীতিতে। তার ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অনিশ্চয়তা আর ভয়-ভয় ভাব। বুঝতে পারে না তার নিরাপত্তা কতটা।

নির্বাচনের ফলাফলে সকলের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। কেউ উৎফুল্ল, কেউ বা বিষণ্ণ। অধ্যাপিকাদের বেশির ভাগ উৎফুল্ল। অথচ তাদের মধ্যে একদা অনেকেই ছিল বামপন্থী। আজ প্রতিকূল হাওয়া দেখে ভোল পাল্টে ফেলতে তাদের একটুও বাধে নি। একেই কি বলে সুবিধাবাদ! জয়া নিজেও তাদের একজন নয় তো? মনের গভীরে দৃষ্টিপাত করল সে। বামরাজনীতির এই বিপর্যয়ে সেও-কি মনে মনে খুশি হয়েছে? না। জয়া তা চায় নি। কোনদিন আর রাজনীতির মধ্যে ফিরে না গেলেও মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার জন্য যারা দায়ী, তাদের জয় সে কামনা করবে না!

পুরো পিরিয়ড না হতেই কলেজ ছুটি হয়ে গেল। কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলে নিঃশব্দে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল জয়া।

বাস-স্ট্যাণ্ডে দেখা বেলার সঙ্গে। তার মুখে বিজয়ীর হাসি। জয়া পার্টি ছেড়ে দিয়েছে শোনার পর সে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জয়া প্রাণখুলে মিশতে পারে নি। অতীতে যে ধরনের নোংড়ামি সে করেছে, অত তাড়াতাড়ি সেসব ভুলে যাওয়া তার

পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও রাজনীতিতে হামেশাই সেরকম ঘটে। আজকের শত্রু কাল বন্ধু হয়ে যায়। আবার আজীবনের বন্ধুও শত্রু হয়।

জয়া বলল, 'কী খবর, তোমরা তো দারুণভাবে জিতেছ! এখন নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মন্ত্রীত্বে যোগ দিয়ে তাড়াতাড়ি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে আর কোন বাধা নেই।'

'সমাজতন্ত্র!' বলল বেলা, 'আমরা কি সমাজতন্ত্রের জন্য তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি? আমরা চাই সন্ত্রাসের অবসান।' জয়া জানে সন্ত্রাস বলতে বেলা কী বোঝাতে চায়। .

'হ্যাঁ, লাল সন্ত্রাসের অবসান হবে ঠিকই,' জয়া বলল, 'কিন্তু শ্বেত সন্ত্রাস? সেটা কি বন্ধ হবে? লক্ষণ দেখে মনে হয় না। নির্বাচনের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

বাসে উঠে পড়ল জয়া। এ সব বিষয় নিয়ে আর তর্ক করতে ভাল লাগে না তার। যা ঘটছে, ঘটতে থাক। এখন কেউ বুঝবে না। বুঝতে চাইবেও না। সাধারণ মানুষ আজ মূক হয়ে আছে। একদিন তারা কথা বলবে, হিসাব-নিকাশ নেবে, বিচার করবে। ততদিন অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই।

বড় রাস্তার মোড়ে বাস থেকে নেমেই জয়া থমকে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করছে। কেমন একটা অজানিত শঙ্কা। বারোটা বেজে গেছে। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। মাথা নিচু করে চলতে গিয়েও জয়া আড়চোখে শহীদ-বেদীর জায়গাটার দিকে একনজর তাকিয়েই অবাক হল। এর মধ্যেই সেখানে ইট-সিমেণ্ট দিয়ে আর একটা নতুন শহীদ-বেদী তৈরি হয়ে গেছে অন্য শহীদদের জন্য। বেদীর মাথায় উড়ছে বিজয়ী দলের পতাকা। হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই জয়ার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম। সেই সকালের ছেলেগুলি এগিয়ে আসছে তার দিকেই— তাদের হাতে পাইপগান, বন্দুক। দু'জনের হাতে দু'টো খোলা-

ব্যাগ। জয়া জানে এগুলোর মধ্যে কী আছে। এ-সব তার অনেক দেখা। হঠাৎ তার পা অবশ হয়ে আসে। পালাবার শক্তি নেই। মাথার মধ্যে কেমন করতে থাকে। সে বুঝতে পারে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ওদের একজনের হাতের বন্দুকের গুলিতে তার দেহ রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়বে। ভয়ে কাঁপতে থাকে জয়া। মৃত্যুভয়। সে অনুভব করতে পারছে তার মৃত্যু একেবারে আসন্ন।

'এই যে—শুনুন।' বন্দুক হাতে একটি ছেলে এসে তার সামনে দাঁড়ায়। জয়া তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

'আপনি না খুব বিপ্লবী!' বিদ্রূপের স্বরে ছেলেটি বলে, 'তবে ভয়ে এত কাঁপছেন কেন? এখন আমরা আপনাকে মেরে এই নর্দমাটায় ফেলে দিলেও আপনার স্বামী বা কমরেডরা এসে বাঁচাতে পারবে না। তাই করব?'

জয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। সে মুহূর্ত গুণতে থাকে কখন একটা গুলি এসে তার বুকে বিঁধবে। ভয় পেলেও সে প্রাণ ভিক্ষে চাইবে না। বরং তাদের বিদ্রূপে তার মধ্যে সাহস ফিরে আসে। মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত হয়।

'মেয়ে-মানুষ বলে রেহাই পেয়ে গেলেন। কিন্তু পার্থকে বলবেন, তার জন্য আমাদের বন্দুকে গুলি মজুত থাকবে। যান।' বলেই ছেলেটি তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল।

জয়া স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলতেই দেখতে পায় রাস্তার দু'দিকের বাড়ির জানালা দিয়ে মহিলা ও পুরুষরা উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। অপমান আর লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে তার। ছেলেগুলোর আচরণের প্রতিবাদে কিছু বলতে পারেনি বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু বলেই বা কী লাভ। তারা এখন বেপরোয়া। তাদের হাতে শক্তি—অতএব তারাই এখন কথা বলবে। যা খুশি করবে।

বাড়ি পৌঁছে জয়া দেখল, শম্পা বসে রয়েছে তার ঘরে !

'শম্পা, তুমি !'

'আপনার খোঁজ নিতে এলাম, জয়াদি ।'

'তোমার কী খবর ?'

'আমার আর কী খবর থাকতে পারে, জয়াদি ! একটা কাজ পেয়েছি—তাই করছি ।'

কেমন বিষণ্ণ দেখায় শম্পাকে। আগে সবসময় যে-হাসিটা লেগে থাকত তার মুখে, সেটা আর নেই ।

শম্পা বলে, 'আপনার জন্য আমার খুব ভাবনা হচ্ছে, জয়াদি । আপনার বোধহয় এখানে থাকা এখন ঠিক হবে না ।'

'কেন, কিছু শুনেছ নাকি ?' জিজ্ঞেস করে জয়া ।

'আমাদের পাশের বাড়ির নান্টু পাড়ায় ফিরে এসেছে। ওরা বলাবলি করছিল—আমার কানে এসেছে।' একটু থেমে শম্পা আবার বলে, 'আমার ভয় হয়—ওরা যদি আপনাকে অপমান করে ? আপনাদের ওপর ওদের ভীষণ রাগ ।'

জয়ার মনে পড়ে, সে-ও তো একদিন এমনি করেই শম্পার কাছে ছুটে গিয়েছিল তপন সম্পর্কে খবর দিতে। সেই খবর পেয়েই তপন সেবার জীবন বাঁচাতে পেরেছিল। শম্পা কি আজ তারই ঋণ শোধ করতে চায় ?

অনেকক্ষণ কথা হল নানা বিষয়ে—তার মধ্যে শম্পা একবারও তপন সম্পর্কে কিছু বলেনি। জয়ার ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে —'শম্পা, তপনকে কি তুমি ভুলতে পেরেছ ?' কিন্তু সে পারেনি জিজ্ঞেস করতে। তবু জয়া মনে মনে কামনা করে—সে যেন তাকে ভুলতে পারে ।

দুপুরে খাওয়ার পর মাথার মধ্যে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল জয়া। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তার খেয়াল নেই ।

হঠাৎ কাজলের ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল।

'দিদিমণি, ঘুমের মধ্যে আপনি গোঙাচ্ছিলেন। আমার ভীষণ ভয় করছিল।' কাজলের চোখেমুখে তখনও ভয়।

জয়ার এতক্ষণে খেয়াল হয়, সে স্বপ্ন দেখছিল। বিশ্রী স্বপ্ন। একটা ঘরের মধ্যে সে একা পড়ে আছে—ঘরটা অন্ধকার, অনেকটা যেন গুহার মত, দেয়ালগুলো পাথরের—আর কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। হঠাৎ সে দেখতে পেল, অন্ধকার ভেদ করে দু'টো জ্বলন্ত চোখ তার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ এসে তাকে পেচিয়ে ফেলে তার মাথাটা মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছে—মৃত্যু-যন্ত্রণায় জয়া প্রাণপণ চিৎকার করে চলেছে। কাজল এসে ডেকে না জাগালে আরও কতক্ষণ তাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত কে জানে?

জয়া ভেবে পায় না, হঠাৎ সে এমন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল কেন? আজকাল মাঝে-মাঝে সে এমনি ভয়ের স্বপ্ন দেখে। যেন সে খুব বিপদে পড়েছে—তাকে সাহায্য করার বা তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। জয়ার মনে হয়েছে—স্বপ্নগুলোর যেন প্রতীকি তাৎপর্য রয়েছে! সেগুলোর সঙ্গে তার জীবনের একটা সম্বন্ধ আছে। নিঃসঙ্গতা বোধই হয়ত তার কারণ। তার মধ্যে দেখা দিয়েছে একরকমের অসহায়বোধ ও নিরাপত্তার অভাব। আর একটা চিন্তা তার মনে জাগে আজকাল। একদিন সে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বার্দ্ধক্যের দ্বারে পৌঁছবে। টুকুনের বিয়ে হয়ে যাবে। তখন আপন বলতে কে থাকবে তার পাশে? বার্দ্ধক্যপীড়িত জীবনের সেই নিদারুণ অসহায় দিনগুলির কথা কল্পনা করে জয়া ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। নিঃসঙ্গতা-বোধ আরও নিবিড় হয়ে ওঠে তখন।

হঠাৎ জয়ার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে। আবার সেই ছেলেগুলি এসে তার ঘরের সামনে দাঁড়ায়। তখন যে ছেলেটি তাকে বন্দুক

দেখিয়ে শাষাচ্ছিল, সে বলে, 'আমরা চাঁদার জন্য এসেছি।'

'কিসের চাঁদা ?'

'আমরা ক্যাম্প করেছি—সেইজন্য।'

'তারজন্য আমি চাঁদা দেব কেন—বলতে পার ?'

'আলবৎ দিতে হবে।' অন্য একটি ছেলে গর্জন করে ওঠে। তাকে থামিয়ে দিয়ে বন্দুকধারী ছেলেটি বলে, 'দেখুন, যে পাড়ায় যে দলের প্রাধান্য, সেই দল পাবলিকের সাহায্য পায়। আপনাদের যখন প্রাধান্য ছিল—অনেক টাকা তুলেছেন। আমাদের লোকরাও রেহাই পায় নি। আপনারা তাদের বাধ্য করেছেন দিতে। এখন তার ব্যতিক্রম হবে ভাবছেন কেন ?'

'কত দিতে হবে ?' জয়া ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করে।

'আপাততঃ শ' দুই দিন। পরে মাসে মাসে যেটা দেবেন, সেটা কিছু কম দিলেও চলবে!' ছেলেটি ঠাণ্ডাভাবেই বলল।

জয়া বুঝতে পারে, যে কারণেই হোক, গুলি করে মারতে না পেরে তাকে এলাকা থেকে তাড়াবার জন্য এটা তাদের একটা কৌশল। এদের সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি হয় না। এই মুহূর্তে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে শুধু বলল, 'ঠিক আছে—আমি ভেবে দেখব। তোমরা পরে এসো।'

'কখন আসব ? কাল ?'

'তাই এসো।'

ছেলেগুলো চলে যাবার ঘণ্টাখানেক বাদে কাজলের মা এসে হাজির হল। সে মেয়েকে নিয়ে যাবে। তাকে নাকি ভয় দেখানো হয়েছে—এ বাড়িতে কাজ করলে কাজলের বিপদ হতে পারে। জয়া আপত্তি জানাতে পারল না। আইবুড়ো মেয়ে, যদি কিছু ঘটে যায়, তার দায়িত্ব কি সে নিতে পারবে ? অতএব কাজলকে ছেড়ে দিতে হল।

জয়া বুঝতে পারছে না এখন সে কী করবে। একা খালি বাড়িতে কেমন করে থাকা সম্ভব! তার ওপর কাজের লোক নেই। রোজ বাজার করা, রান্না করা ইত্যাদি কাজগুলোই বা কে করবে? এ-সব কাজে জয়া যে একেবারে অনভ্যস্ত। অবিশ্যি বাড়িটাতে তালা লাগিয়ে মা-এর কাছে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও তার মন সায় দেয় না। পার্থর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ব্যাপার নিয়ে সেই যে মা-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তারপর আর জয়া ও বাড়িতে যায়নি। অন্য আত্মীয়-স্বজন যারা আছে, তাদের কারুর বাড়িতে গিয়ে ওঠার প্রশ্নই আসে না। না, জয়াকে হস্টেলেই যেতে হবে। সে মনস্থির করে ফেলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে দেখে জয়া উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি জানালাগুলো বন্ধ করে দেয়। পাড়াটা যেন কেমন নিঝুম। দিনের বেলাও লোকজন ভয়ে বেরোয় না। নতুন পরিবর্তনের মুখে কিছুদিন এমন চলবে। তারপর আবার তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। জয়ার অবাক লাগে ভাবতে। জনগণকেই না তারা সবার উপরে স্থান দেয়! তারাই না ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি! অথচ এই ক'বছর সেই জনগণের কোন ভূমিকা নেই। তারা নির্বাক দর্শক মাত্র।

হঠাৎ চমকে ওঠে জয়া। তার বাড়ির ঠিক সামনেই পর-পর দু'টো বোমা ফাটল। বোমার শব্দে জানালাগুলো কেঁপে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। একটা উত্তেজনা ক্রমে তার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। না, ওরা পারবে না তাকে ভয় পাওয়াতে। সন্ত্রাসকে জয়া ঘৃণা করে। কোন সন্ত্রাসের ভয়ে সে নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করেনি। আজও করবে না। যারা সন্ত্রাসকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়, তারা আসলে ক্লীব। মানুষের ওপর তাদের বিশ্বাস নেই। তাদেরও মানুষ বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই সাধারণ মানুষের হাতেই রয়েছে ইতিহাসের বিচার-দণ্ড—যেদিন তারা আত্ম-

বিশ্বাস ফিরে পাবে, সেদিন তারা তৈরি করবে নতুন ইতিহাস।

'জয়া!'

কে যেন ডাকল তার নাম ধরে। দরজায় খটখট শব্দ।

'জয়া, দরজা খোল!'

জয়া ভুল শুনছে না তো? এ-ও কি সম্ভব! না কি তার অবচেতন মনের কোন ইচ্ছাপূরক ব্যাপার! তেমন কোন ইচ্ছা কি তার মনের গভীরে ছিল?

'ভয় নেই জয়া—আমি শান্তনু।'

মুহূর্তে জয়ার সমস্ত শরীর কেমন অবশ হয়ে পড়ে। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনার ফল। সে নিজেকে জোর করে টেনে দরজার সামনে নিয়ে যায়। তালা খুলে দুই হাতে টেনে কাঠটা সরিয়ে দরজাটা খুলতেই সে চোখের সামনে দেখতে পায় শান্তনুকে। তার মুখ থেকে কথা বেরোয় না। কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টি তার চোখে। শান্তনু হয়ত কিছু অনুমান করে থাকবে—সে ঘরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে খিল এঁটে দেয়।

শান্তনু বলে, 'আমি কিছু আশঙ্কা করেছিলাম—তাই তোমার খোঁজ নিতে এলাম।'

সেটা না বললেও জয়া বুঝতে পারে। নইলে অমন আকস্মিক ভাবে রাত্রিবেলা কেন সে এসে হাজির হবে!

'তুমি কি অসুস্থ?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'না। এমনি মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। বস।' শান্তনুকে চেয়ারে বসতে বলে জয়া বিছানায় বসে।

'তোমাকে আসতে দেখে ওরা কিছু বলে নি?' জয়া জিজ্ঞেস করে।

'না, তেমন কিছু না। ওরা হয়ত এখনও আমাকে তাদের শরিক দলের লোক বলেই জানে।' তারপর একটু থেমে শান্তনু

আবার বলে, 'ওরা তোমার সঙ্গে কি খুব খারাপ ব্যবহার করেছে?' তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

'ওরা আমাকে রাস্তায় অপমান করেছে। বিকেলে টাকা চাইতে এসেছিল—দিইনি, তাই ভয় দেখিয়ে গেছে। একটু আগে বাড়ির সামনে বোমা ফাটিয়েছে।' বলেই জয়া শান্তনুর দিকে তাকায়। সে ভুল দেখেনি তো? এক পলকের জন্য শান্তনুর দুই চোখে যেন আগুণ জ্বলে উঠল। জয়ার অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়! নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল তার। কেন সে কেতকীর কথা ভেবে মিথ্যে সন্দেহে মিছামিছি ঈর্ষার আগুনে নিজেকে দগ্ধ করেছে এতদিন!

জয়া বলে, 'কাজের মেয়েটা ভয় পেয়ে চলে গেছে। তুমি বস—আমি চা ক'রে আনছি।' বলে সে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে দুই-কাপ চা নিয়ে ফিরে এসে সে দেখতে পায়, শান্তনু ঘরের এদিক-ওদিক দেখছে।

'কী দেখছ?' জয়া জিজ্ঞেস করে।

'ঘরের এমন জীর্ণ দশা কেন? মনে হচ্ছে, দেওয়ালগুলোতে অনেকদিন রঙ করাওনি। দরজা-জানালার রঙও চটে গেছে।'

জয়ার মনে পড়ে, একদা এই বাড়িটার ইটপাথরের সঙ্গে মিশে ছিল শান্তনুর মমতা। তারপর আজকের মতই এক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে না তাকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল এই বাড়ি! সে কি আজ সেই অভিশপ্ত দিনগুলির কথা ভাবছে?

'নাও—চা খাও।' জয়া ছোট টেবিলটার ওপর চা-এর কাপটা রাখে।

টেবিলের সামনে জয়ার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে চা খেতে-খেতে শান্তনু বলে, 'এখানে এ-ভাবে তোমার থাকা চলতে পারে না।'

'তা তো বুঝতে পারছি,' জয়া বলল, 'কিন্তু যাব কোথায়?

চট করে কি হস্টেলে কোন সিট পাওয়া যাবে ?'

'হস্টেলে কেন ?' শান্তনু বলে ওঠে, 'তুমি টুকুনের কাছে থাকবে যতদিন অবস্থা নরম্যাল না হচ্ছে।'

'তা কেমন করে হয় ?' নিজের অজ্ঞাতে জয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। খুব কিছু ভেবে সে বলেনি কথাটা।

কিন্তু শান্তনু অন্যভাবে তার অর্থ গ্রহণ করে। তার মুখে অপ্রস্তুত ভাব। সে মৃদু হেসে বলে, 'ভয় নেই—আমি অন্য জায়গায় থাকব। কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি রয়েছে—সেখানে থাকতে আমার অসুবিধে হবে না।'

জয়া কী বলবে, ভেবে পায় না। তার কথাটার এমন একটা অর্থ দাঁড়িয়ে যাবে, বুঝতে পারেনি সে। অথচ শান্তনুকে সে বলতে পারছে না যে তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, বরং আপত্তি তো দূরের কথা, তার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকাটাকে সে এক অসম্ভব সৌভাগ্য বলে মনে করে আজ। কিন্তু এই বয়সের বস্তুবাদী মন নিয়ে তার পক্ষে এতটা আবেগের প্রশ্রয় দিতে বাধে।

শান্তনুর দৃষ্টি তার মুখে আবদ্ধ। সে বলে, 'তবে কী করতে চাও বল।'

জয়া স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি ঠিক ও-সব ভেবে বলিনি। তুমি ভুল বুঝেছ। আমাকে যদি তোমার ওখানে যেতে হয়, তবে শুধু সেইজন্যই তোমাকে গিয়ে অন্যের বাড়িতে থাকতে হবে—এটা কি আমি হতে দেব ?'

শান্তনুর চোখে বিস্ময়। তার চোখের এই দৃষ্টি জয়ার চেনা। এই চাওনি মেখলাদিনের বিদ্যুৎচমকের মত অনেক কথা তাকে মনে করিয়ে দেয়। একরাশ আবেগের ঝাপটা এসে তার হৃদয়ে আছড়ে পড়ে। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

'শান্তনু ! তুমি কি আজও আমাকে বুঝতে পারনি ?'

স্বগতোক্তির মত কথাগুলো বলে জয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে। হঠাৎ তার কান্না পেয়ে যায়। চেষ্টা করেও সে কান্না থামাতে পারে না। শান্তনু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

এক সময় সে বলে, 'জয়া—ওঠো। তৈরি হয়ে নাও—রাত হয়ে যাচ্ছে।'

জয়া মুখ তোলে। সে বলে, 'এই রাতের অন্ধকারে আমি লুকিয়ে পালাতে চাইনে, শান্তনু। যদি যেতে হয়, দিনের আলোয় ওদের সামনেই যাব।'

শান্তনু কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'বেশ, তাই হবে। আমি বড় রাস্তা থেকে একজনকে একটা ফোন করে আসি বাসায় খবরটা দেওয়ার জন্য—নইলে ওরা ভাববে।'

'তুমি বাড়ি যাবে না?'

'এ-ভাবে তোমায় একা ফেলে যাব?'

জয়া নির্বাক বিস্ময়ে শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, এই তো সেই মানুষটা যাকে তার অদেয় কিছু নেই—অতীতের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি বিভ্রান্তি সত্ত্বেও। এই মুহূর্তে তার মনে হতে থাকে, পৃথিবীতে আর সে একা নয়। একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতার যে বেদনা তার জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছিল, সে-সব যেন কোথায় নিমেষে উধাও হয়ে গেছে।

শান্তনু মৃদু হেসে আবার বলে, 'তোমার কী মনে হয়—তোমায় এভাবে একা ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব?'

আনন্দে জয়ার কান্না পায়। সে জানে, সম্ভব নয়। বুঝতে ভুল হয় না তার। আর ভুল হবে না। কোনদিন না।